কল্পনার বিজ্ঞান

ট্যাকিয়ন

ডিসেম্বর, ২০২২

জোতির্বিজ্ঞান

চাঁদে মানব অবযাত্রার নতুন সূচনা। আবার চাঁদে যাচ্ছে মানুষ!

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

পোষা বিড়ালকে বাহিরে রেখে বিপদে পড়ছেন। না তো?

কম্পিউটার বিজ্ঞান

মেশিং লার্নিং জিনিসটা আসলে কী?

ভেতরে যা যা আছে

•••

আমাদের কিছু কথা... ৩

পোষা বিড়ালকে বাহিরে রেখে বিপদে পড়ছেন না তো?... ৪

আর্টেমিস ১ - চাঁদে মানবযাত্রার পূর্ণজাগরণ... ৬

লাল চাঁদের রহস্য সমাধান... ১৬

কম্পোজিট ফাংশন - f ∘ g দ্বারা আসলে কী বুঝায়?... ২১

হৃদরোগের চিকিৎসায় কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইড ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি... ২৩

'Machine Learning' জিনিসটা আসলে কী?... ২৬

Circadian rhythm: একটি জৈবিক ঘড়ি... ৩১

মন্টি হলো প্রবলেম... ৩৪

চুইংগাম যেভাবে ইমোশন কন্ট্রোল করে... ৩৮

ট্যাকিয়ন

কল্পনার বিজ্ঞান

জুলাই ২০২২ সংখ্যা

ম্যাগাজিন-যোদ্ধারা

রওনক শাহরিয়ার

সানজিদা ইসলাম শেফা

কে. এম. শরীয়াত উল্লাহ

আমাদের কিছু কথা

সেই কোনো এক কালে মানুষ চাঁদে গিয়েছিল। এরপর বহুকাল কেটে গিয়েছে। হুট করে আবার ২০২২ সালে মানুষ চাঁদে গেল। কেন মানুষ এতোদিন চাঁদে যায় নি, কেনই বা হুট করে আবার চাঁদে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ল, চাঁদে গিয়ে মানুষ এবার কী কী করবে সবকিছু নিয়েই এবারের সংখ্যাটি সাজানো হয়েছে ম্যাগাজিনের। এছাড়াও থাকছে নানা সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে লেখা আর্টিকেল। পাঠকদের সাথে সংযুক্ত হতে রয়েছে গোপন সংকেত উদ্ধারের খেলা।

ট্যাকিয়ন একটি বিজ্ঞান সংগঠন হিসেবে সবার কাছে বিজ্ঞানের ব্যাপারগুলো বৈজ্ঞানিকভাবেই তুলে ধরতে পছন্দ করে। তবে এখানে কল্পনা শক্তির জন্যও কোনো বাধা নেই। আমাদের এই বিজ্ঞান কল্পনাকে আটকাবে না, বাধা দিবে না।

- সম্পাদকমণ্ডলী

আমাদের সাথে যুক্ত হতে

আমাদের ওয়েবসাইট: https://tachyonts.com

আমাদের ফেইসবুক পেইজ: www.facebook.com/TachyonTs

আমাদের ফেইসবুক গ্রুপ: www.facebook.com/groups/tachyonts

আমাদের ইউটিউব চ্যানেল: https://youtube.com/c/tachyonts

আমাদের ই-মেইল: editortachyon@gmail.com

পোষা বিড়ালকে বাইরে রেখে বিপদে পড়ছেন না তো?

হায়াত মোহাম্মদ ইমরান আরাফাত
শিক্ষার্থী, কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী

আমরা যারা বিড়াল পুষি তারা অনেকেই বিড়ালকে বাইরে ছেড়ে রাখি। এক্ষেত্রে আমাদের সকলের প্রধাণ উদ্দেশ্য অনেকটা এমন যে - আমাদের বিড়াল বাইরে থেকে বাইরে পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে সক্ষম হবে এবং তাদের লাইফ অ্যাডভেঞ্চারে ভরপুর হবে। আবার অনেক বিড়াল আছে যাদেরকে বাইরে যেতে না দিলে চিল্লাচিল্লি করে বাড়ি মাথায় তোলে! কিন্তু বিড়ালদের এভাবে বাইরের পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া আসলে কতটুকু সঠিক সিদ্ধান্ত? ভেবেছেন কখনও? এ প্রসঙ্গে গবেষকরা কিন্তু ভিন্নমত পোষণ করছেন! তাদের গবেষণামতে পোষা বিড়ালকে বাইরে বের হতে না দেওয়াই বিড়ালের জন্য উপকারী! কিন্তু কেন? চলুন বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক।

সম্প্রতি ম্যারিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক বাইরে বের হওয়া পোষা বিড়ালদেরকে নিয়ে একটি গবেষণা করেছেন। তাদের গবেষণা প্রবন্ধটি গত ২১ নভেম্বর *Frontiers in Ecology and Evolution* নামক এক জার্নালে প্রকাশিত হয়। এজন্য তারা ওয়াশিংটন ডিসি শহরের বিভিন্ন স্থানে ৬০টি মোশন ক্যামেরা স্থাপন করেছিলেন। (*এই ক্যামেরাগুলো নড়াচড়া করে আশেপাশের পরিবেশের ছবি ভালোভাবে তুলতে পারে*)। সবশেষে তাদের মতামত হচ্ছে, কমপক্ষে বিড়ালের নিজস্ব নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য হলেও বিড়ালকে বাইরে যেতে দেওয়া উচিত না! আর বিড়ালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা মানুষের দায়িত্ব!

কেন পোষা বিড়ালকে বাইরে যেতে দেওয়া উচিত না, সেই ব্যাপারে এই গবেষকদের প্রধান কিছু পয়েন্ট নিচে আলোচনা করা হলো।

১. বিড়ালের নিজস্ব শারিরীক নিরাপত্তা

গবেষকদের লাগানো ক্যামেরা থেকে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, ৬১% বিড়ালকে র‍্যাকুনের বিচরণস্থলের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে। এছাড়াও ৬১% কে অ্যামেরিকান রেড ফক্সের আবাসস্থলের আশেপাশে এবং ৫৬% বিড়ালকে ওপোসাম (opossums) -দের সাথে মেলামেশা করতে দেখা গিয়েছে! বিষয়টি উদ্বেগজনক; কেননা এই তিন ধরনের প্রাণী

থেকেই জলাতঙ্ক ছড়ায়। তাই এই ধরনের প্রাণী থেকে বিড়ালেরও জলাতঙ্ক হতে পারে। তাই বিড়ালকে সুস্থ রাখার জন্য বাইরে বের হতে না দেওয়াই ভালো! বাংলাদেশের বিড়ালগুলোও যেসব জায়গায় চলাফেরা করে সেসব জায়গা থেকে নানা রোগ-বিরোগ নিয়ে আসা অসম্ভব কিছু না। এছাড়াও অনেক দুষ্ট মানুষ আছেন যারা অকারণে বিড়ালদের নির্যাতন করে থাকেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে!

২. মানুষের শারিরীক নিরাপত্তা

আগের পয়েন্টে আমরা আলোচনা করেছি যে, জলাতঙ্কের জীবাণু বহনকারী বিভিন্ন প্রাণির সংস্পর্শে আসার ফলে বিড়ালের জলাতঙ্ক হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে! একই কথা খাটে মানুষদের জন্যেও। আপনার পোষা বিড়াল বাইরে থেকে জলাতঙ্কের জীবাণু বহন করে নিয়ে আসলে তা যে আপনাকেও আক্রমণ করবে না; তার নিশ্চয়তা কতটুকু? তাই নিজে এবং নিজের বিড়ালকে সুস্থ্য রাখতে হলে বিড়ালকে বাইরে বের হতে দেওয়ার অভ্যাস বন্ধ করা জরুরি।

৩. পারিপার্শ্বিক জীববৈচিত্র রক্ষা

গবেষকরা লক্ষ করেন যে, বাইরে ঘুরে বেড়ানো বিড়ালরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইঁদুর, কাঠবিড়ালি, খরগোশ ইত্যাদি প্রাণী শিকার করছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, যেহেতু এগুলো আমাদের সাপেক্ষে অপকারী জীব; সেহেতু এগুলো শিকার করলে কোনো সমস্যা নেই! কিন্তু আদতে এসব প্রাণী শিকার করার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। মজার ব্যাপার যে, বিড়াল ইঁদুর শিকার করার কারণ হচ্ছে যে, বিড়াল ইদুরকে ভয় পায়; বলছেন গবেষকরা। তাই পরিবেশের জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বিড়ালকে সামলে রাখা জরুরি।

সর্বোপরি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পোষা বিড়ালকে বাইরে ছেড়ে দিলে তা আসলে আমাদের জন্য উপকারের বদলে ক্ষতিই বয়ে আনতে পারে! তাই যতটুকু সম্ভব নিজের পোষা বিড়ালকে ঘরেই রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন গবেষকরা।

তথ্যসূত্র -

[1] Daniel J. Herrera et al, Spatial and temporal overlap of domestic cats (*Felis catus*) and native urban wildlife, *Frontiers in Ecology and Evolution* (2022). DOI: 10.3389/fevo.2022.1048585

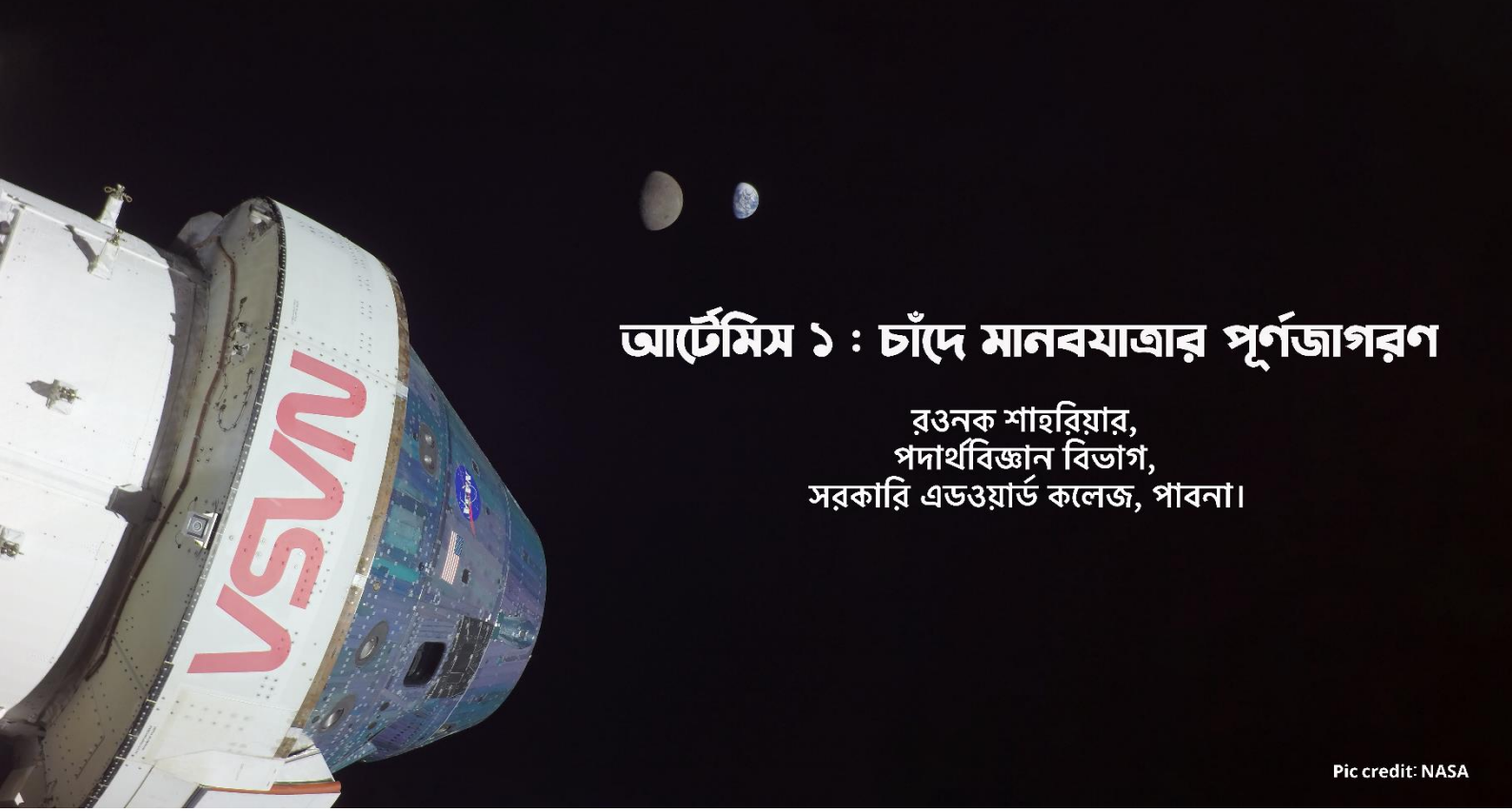

আর্টেমিস ১ : চাঁদে মানবযাত্রার পূর্ণজাগরণ

রওনক শাহরিয়ার,
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ,
সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা।

১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭২! বারো দিনের দীর্ঘ সফর শেষে পৃথিবীতে এলো মহাকাশযানটি। অভিযানটি মহাকাশে যাত্রার পূর্বের সকল অভিযানের রেকর্ড ভাঙল বহুদিক দিয়ে! চারদিকে সেই যাত্রার জয়জয়কার। মহাকাশযানটি আসার পরপরই হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল সেই দীর্ঘদিন ধরে চলা মিশনটা। হ্যাঁ, এখানে অ্যাপোলো মিশনের কথা বলা হচ্ছে, যার মাধ্যমে প্রায় ১০ বছরে ১২ জন মানুষ চাঁদের বুকে নিজের পদচিহ্ন রেখেছেন। সারা বিশ্ব তাকিয়ে দেখেছে, মানুষ শুধু পৃথিবীতেই নয়, বরং বাহিরেও নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে! কিন্তু সর্বশেষ অ্যাপোলো ১৭ মিশনের পরই স্তব্ধ হয়ে গেল চন্দ্রাভিযানের সকল যাত্রা। কোল্ড ওয়ারের যে আমেজে আমেরিকা রাশিয়া স্পেইস প্রোগ্রামে নিজেদের কাড়ি কাড়ি টাকা ঢালছিল, তার সবটায় ভাটা পড়ল। স্পেইস নিয়ে এরপর মানুষের আগ্রহ দিনদিন বাড়লেও, চন্দ্রাভিযান নিয়ে কোনো দেশকে বড়ো পরিকল্পনা নিয়ে আগাতে দেখা যায়নি।

তবে আজ প্রায় ৫০ বছর পর, নাসা নিজেদের সেই চন্দ্রাভিযানকে আবার পূর্ণর্জীবিত করতে যাচ্ছে! এবারের পরিকল্পনা আরও বড়ো, আরও বেশি জটিল, আরও দীর্ঘমেয়াদি। হয়তো ২৫' সাল নাগাদ চাঁদের বুকে গড়ে তোলা যাবে মানুষের আবাস! কিছুদিন আগের 'আর্টেমিস' নামক স্পেইস প্রোগ্রামের মাধ্যমে এই অভিযানের সফলতার প্রথম ধাপ সম্পন্ন হলো! ২৫.৫ দিনের যাত্রা শেষে অরিয়ন স্পেইসক্রাফট ১১ ডিসেম্বর পুনরায় পৃথিবীতে প্রবেশ করে। নতুন এক মাইলফলক স্পর্শ করল মানবজাতি, সাথে উন্মোচন করল আগামির মহাকাশে

আর্টেমিস মিশনের মাধ্যমে নাসা আবার ৫০ বছর পর চাঁদে পুনরায় নিজেদের অবস্থান জানান দিয়েছে। (ছবি: Getty image)

পথচলার নতুন দুয়ার। এখন আর্টেমিস প্রোগ্রামটা কেন, বা মানবজাতির জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমরা আলোচনা করব!

আর্টেমিস নামের ইতিহাস

এবারের চন্দ্রাভিযানের নামকরণ করা হয়েছে 'আর্টেমিস'। আর্টেমিস হলো গ্রীকদের চন্দ্র দেবি, যিনি আবার সূর্যের দেবতা অ্যাপোলোর জমজ বোন।

আবার ক্রু মডিউল স্পেইসক্রাফটের নাম অরিয়ন রাখা হয়েছে। অরিয়ন আকাশের সবচেয়ে পরিচিত কনস্টলেশন, যেখানে গ্রীক মিথোলজি অনুযায়ী অরিয়ন আর্টেমিসের সহযোগীকে হত্যা করেছিল।

চমৎকার এই নামকরণ মিশনের সাথে শুধু মানানসই নয়, বরং আর্টেমিসে এমন কিছু হতে চলেছে, যেটা কোনো অ্যাপোলো মিশনে হয়নি। প্রথমবারের মতো কোনো নারী এবং ভিন্ন বর্ণের নভোচারী চাঁদে নিজের পদচিহ্ন রাখতে চলেছে এই আর্টেমিস প্রোগ্রামের মাধ্যমে। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতেও বসতি স্থাপন করতে যাচ্ছে, যেখানে মানুষ আগে কখনও যায়নি।

অ্যাপোলো - ১৭ অভিযানে চাঁদে যানবাহন যাত্রার সময়ের চিত্র। ছবি: NASA

আর্টেমিসের উদ্দেশ্য কী, কেনই বা যাচ্ছে।

প্রায় ৫০ বছর হঠাৎ করে চন্দ্রাভিযান নতুন করে শুরু করা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে। আমাদের এখানে খেয়াল রাখতে হবে, আর্টেমিস প্রোগ্রামের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অ্যাপোলোর চেয়ে ভিন্ন। ৬০' এর দশকে অ্যাপোলো প্রোগ্রাম আমেরিকা ও রাশিয়ার বিপক্ষে চলা দীর্ঘদিনের কোল্ড ওয়ারের ফসল। সেখানে আর্টেমিস হতে চলেছে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা, যেখানে নাসার তত্ত্বাবধানে কানাডা স্পেইস এজেন্সি (CSA), জাপান এয়ারোস্পেইস এক্সপ্লোরেশন এজেন্সি (Jaxa), এবং ইউরোপীয়ান স্পেইস এজেন্সি (Esa) সরাসরিভাবে যুক্ত রয়েছে।

তাছাড়া এবারের অভিযান শুধু চাঁদে পতাকা বা পদযাত্রাই না। বরং এবারে লক্ষ্য হলো চাঁদে মানব বসতির টেকসই স্থাপনা নির্মাণ, চাঁদে মানব অস্তিত্ব বজায় রাখা, এবং ভবিষ্যতে মঙ্গলগ্রহ যাত্রা। এছাড়াও বৈজ্ঞানিক গবেষণা,

অর্থনৈতিক ক্ষেত্র তৈরী এবং নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞানচর্চায় অনুপ্রাণিত করাই আর্টেমিসের মূল লক্ষ্য।

আর্টেমিস যাত্রা:

নাসা আর্টেমিস প্রোগ্রাম কয়েকটা ধাপে সম্পন্ন করবে। মোট তিন ধাপে তিনবার চাঁদের উদ্দেশ্য রকেট প্রেরণ করা হবে।

প্রথম ধাপ হলো আর্টেমিস ১, যেটা মনুষ্যবিহীন একটা টেস্ট ফ্লাইট ছিল, ১১ই ডিসেম্বর চাঁদকে আবর্তন করে পৃথিবীতে পৌঁছেছে।

দ্বিতীয় ধাপ হলো আর্টেমিস ২, এর মাধ্যমে মানুষকে মহাকাশযাত্রার ইতিহাসে সবচেয়ে দূরে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। ২০২৪ নাগাদ এই মিশন পরিচালিত হবে।

তৃতীয় ধাপ বা আর্টেমিস ৩ এর মাধ্যমে প্রথম নারী নভোচারী এবং ভিন্ন বর্ণের মানুষ চাঁদে পা রাখবে। ২০২৫ সাল নাগাদ এই যাত্রা শুরু হবে।

এবং চতুর্থ ধাপে আর্টেমিস ৪, ৫, ৬ সহ মিশন আসতে পারে। অফিসিয়ালি কোনো ঘোষণা এখনও আসেনি।

১৯৭২ এর অ্যাপোলো ১৭ মিশনের পর আর্টেমিস ৩ হবে মানব অধ্যুষিত প্রথম যাত্রা। যদিও নাসার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাগুলো আরও বড়ো, বেশ উচ্চাভিলাষী। আর্টেমিস মিশনগুলো ব্যবহৃত প্রযুক্তি এবং গবেষণা ব্যবহার করে নাসা ভবিষ্যতে মঙ্গলে মানবযাত্রা এবং বসবাস উপযোগী করতে চায়।

চাঁদ থেকে মঙ্গল পরিকল্পনার মাঝে রয়েছে চাঁদের কক্ষপথে স্পেইস স্টেশন নির্মাণ, চাঁদে বাসযোগ্য বসতি স্থাপন করা।

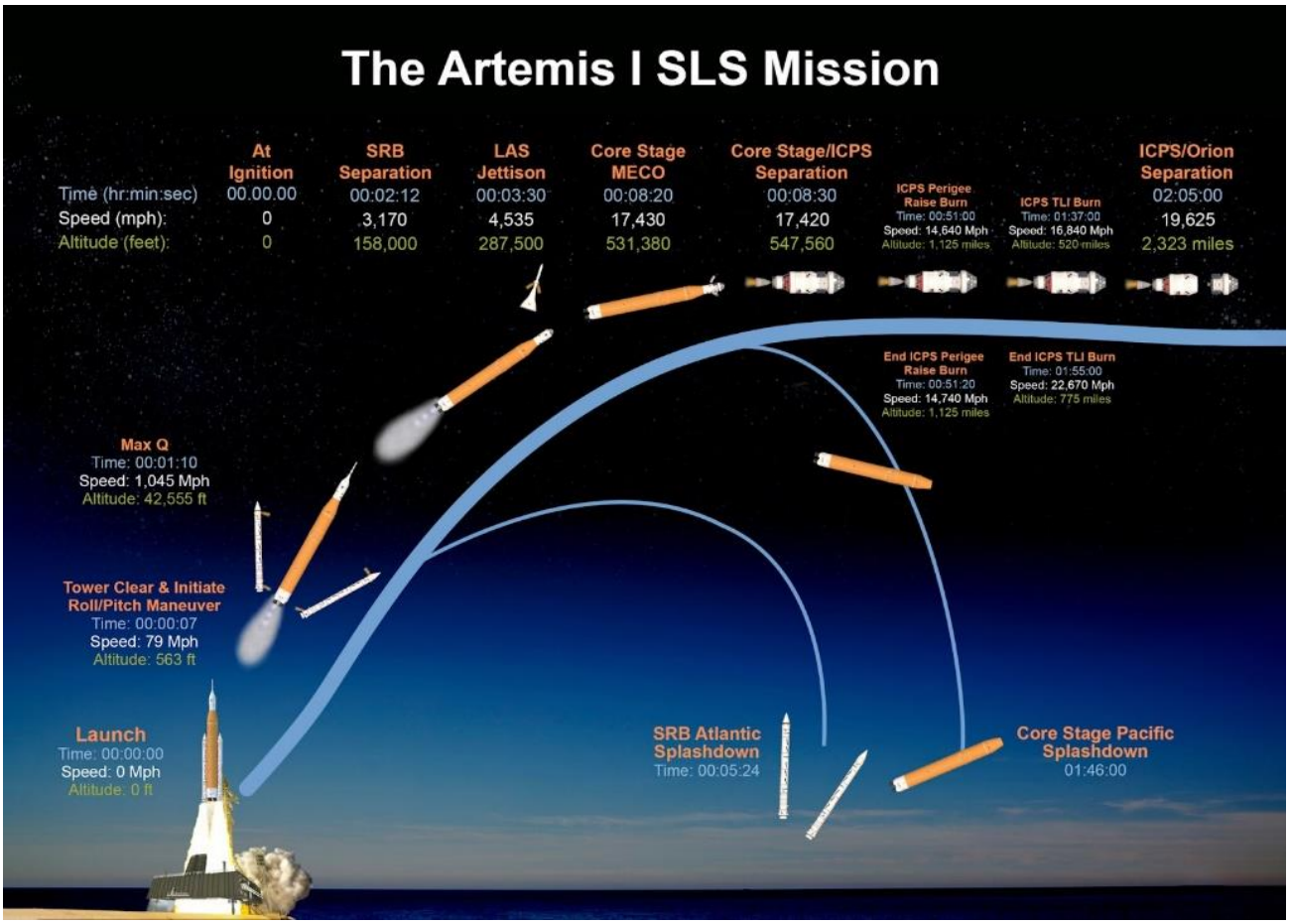

আর্টেমিস ১ এর সফল যাত্রা

আর্টেমিস ১ এর উড্ডয়নের মূল তারিখ থেকে প্রায় আড়াই মাস দেরি হয় বৈরি আবহাওয়ার জন্য। ৪ নভেম্বর জে এফ কেনেডি স্পেইস সেন্টারের লাঞ্চ প্যাড ৩৯বি -তে আনা হয়। হারিকেন ল্যানের পর ১৬ই নভেম্বর উড্ডয়নে সক্ষম হয়!

আর্টেমিস ১ -কে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে স্পেস লঞ্চ সিস্টেম (এসএলএস)। এই দৈতাকৃতির রকেটের এটিই প্রথম পরীক্ষামূলক মহাকাশযাত্রা। এটা আগের চন্দ্রমিশন অ্যাপোলো অভিযানের স্যাটার্ন ভি এর চেয়ে শক্তিশালী এবং আধুনিক। শক্তিশালী হওয়ার কারণ হলো থ্রাস্ট বা পৃথিবী থেকে মহাকাশে যেতে রকেটের প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন।

এসএলসি ৩.৯ মিলিয়ন কেজি থ্রাস্ট উৎপাদন করে উড্ডয়নের জন্য, যা স্যাটার্ন ভি এর চেয়ে ১৫% বেশি। এটা ২.৭ মিলিয়ন কেজির বস্তুকে পৃথিবীর কক্ষপথে নিয়ে যেতে সক্ষম।

এটা পর্যন্ত নাসার সবচেয়ে শক্তিশালী রকেট এটি, যার দৈর্ঘ্য ৩২২ ফুট (৯২ মিটার)। আর্টেমিস ১ -কে সঙ্গে নিয়ে এসএলএসের অভিযানটি ছিল মনুষ্যবিহীন। অর্থাৎ এই টেস্ট ফ্লাইটে কোনো নভোচারী ছিল না।

চারজন নভোচারী যাওয়ার মতো ব্যবস্থা রাখা হয়েছে অরিয়ন নামে আর্টেমিসের মাথায় বসানো ‘ফেয়ারিং’ বা ভারবাহী অংশটিতে। আপাতত নভোচারীদের পরিবর্তে আর্টেমিস ১ নভোযানে পাঠানো হয়েছিল ৩টি ম্যানিকুইন বা ডল পুতুল (স্নুপ ডল)।

মহাকাশে প্রবেশের পর সোলার প্যানেল বের হয়ে আসে এবং ইন্টারিয়াম ক্রায়োজেনিক প্রপালশন স্টেজ (আইসিপিসি) পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে অরিয়নকে চাঁদের দিকে নিয়ে যেতে প্রয়োজনীয় শক্তি প্রদান করে।

এই পুতুলই ছিল এবারের নভোচারী।
ছবি: NASA

অরিয়ান ইতোপূর্বে ২০১৪ সালে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছে টেস্ট ফ্লাইটে, তাই মহাকাশে প্রথমবার না বলা যায়। কিন্তু চাঁদের উদ্দেশ্য এটা তার প্রথম যাত্রা। সার্ভিস মডিউলের মাধ্যমে অরিয়ন স্পেইসক্রাফটের মূল প্রপালশন সিস্টেমে শক্তি প্রদান করবে এবং নভোচারীদের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও বাতাসের ব্যবস্থা থাকছে।

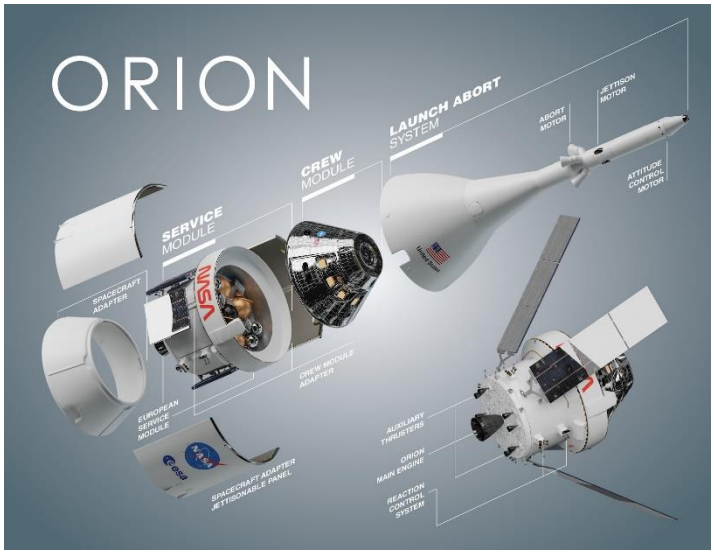

অরিয়ন ক্রু মডিউল, কমান্ড মডিউল ও সার্ভিস মডিউল। ছবি: NASA

অরিয়ন মিশন:

অরিয়ন আর্টেমিস ১ মিশনের দশম দিনে চাঁদের কক্ষপথে পৌঁছায়। এই সময় প্রথম ফ্লাই-বাইয়ে চাঁদের পৃষ্ঠের ৬২ মাইলের কাছ দিয়ে উড়ে যায়। এটা চাঁদের মহাকর্ষকে কাজে লাগিয়ে তার কক্ষপথে প্রবেশ করে, যা চাঁদ থেকে ৪০০০০ মাইল দূরে। স্পেইসক্রাফটটি মোট ৬ দিন অবস্থান করেছে চাঁদের কক্ষপথে। মিশনের এই সময় প্রয়োজনীয় ডেটা সংগ্রহ এবং পৃথিবীতে মিশন কন্ট্রোলে প্রতিনিয়ত তথ্য প্রেরণই ছিল মূল কাজ। এরপর দ্বিতীয় বারের মতো চাঁদের কাছাকাছি ফ্লাইবাই করে প্রায় ৬০ মাইলের মাঝে, যেখানে সার্ভিস মডিউল চাঁদের গ্রাভিটিকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর দিকে যাত্রা শুরু করে। এটা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ২৫০০০ মাইল বেগে প্রবেশ করে, এবং তাপমাত্রা প্রায় ৫০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে এসে পৌঁছায়।

এই সংক্ষিপ্ত যাত্রায় অরিয়ন ১.৩ মিলিয়ন মাইল দূরত্ব ভ্রমণ করে। অবশেষে ২৬তম দিনে প্রশান্ত মহাসাগরে সফলভাবে অবতরণ করে।

অরিয়ন ক্যাপসুল প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ। ছবি: Getty image

লুনার গেটওয়ে

আর্টেমিস যাত্রার আরেকটা উদ্দেশ্য হলো, লুনার অরবিটাল প্ল্যাটফর্ম গেটওয়ে বা চাঁদের কক্ষপথে একটি ছোটো স্পেইস স্টেশন তৈরি করা। এটা আগামীতে চাঁদ এবং তার পরবর্তী গন্তব্যে যেতে সহায়তা করবে। অরিয়ন মডিউল এই গেটওয়েতে ডক করবে, এবং এখান থেকে লুনার ল্যান্ডিং মডিউলে নভোচারী প্রবেশ করবেন। আইএসএস এর মতো এই লুনার গেটওয়েতে সবসময় মানুষ থাকবে না, তবে এটা স্বল্প সময়ের মাঝে গবেষণা ও বেঁচে থাকার স্থান হিসেবে বিবেচিত হবে।

এছাড়াও নাসা স্পেইসএক্সের 'ইউম্যান ল্যান্ডিং সিস্টেম' ব্যবহার করে নভোচারীদের ২০২৫ নাগাদ চাঁদে অবতরণের পরিকল্পনা রয়েছে। এজন্য স্পেইস এক্সের সাথে ২.৯ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছে নাসা। তাছাড়া ইউরোপীয় স্পেইস এজেন্সির সাভিস ব্যবহার করা হয়েছে অরিয়ন স্পেইসক্রাফটে। খরচের কথা আসলে, এসএলসির প্রতিটা উড্ডয়নে খরচ হবে ৮০০ মিলিয়ন ডলার। এটা পুনঃব্যবহার সম্ভব না হওয়াই, খরচ অনেকটা বেশি। আর্টেমিসের তিন মিশনের পেছনে মোট ৯৩ বিলিয়ন ডলার অর্থ খরচ হবে। প্রায় ২১টা দেশের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ব্যয়ভার বহন করা হবে।

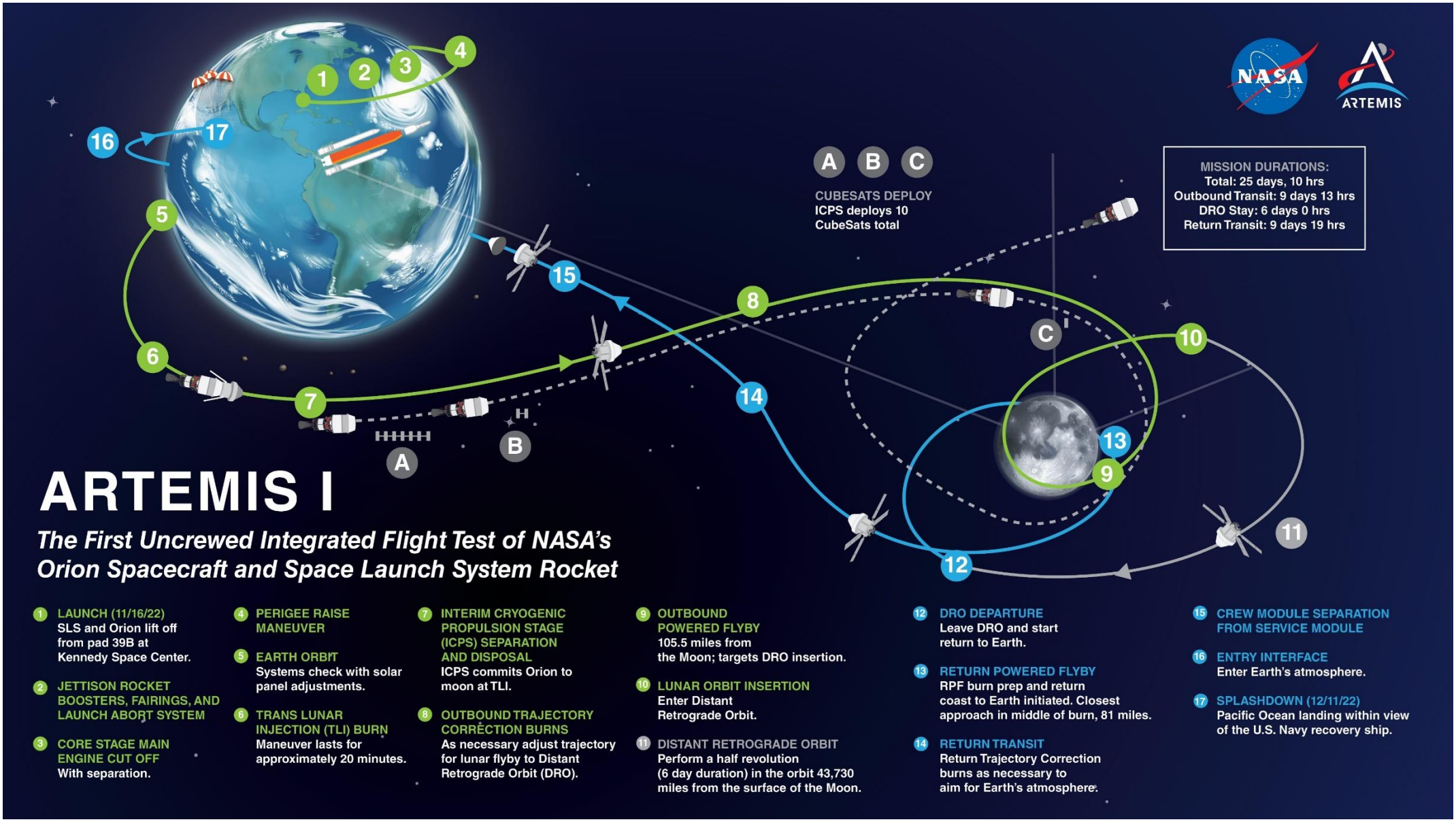

আর্টেমিস ১ এর যাত্রাপথ। ছবি: NASA

আর্টেমিসের যাত্রা পথের ছবি এবং পৃথিবী ও চাঁদের তোলা ছবি

অরিয়নের যাত্রার নবম ঘণ্টায় তোলা ছবি।
ছবি: twitter/NasaArtemis

অরিয়নের অপটিক্যাল ক্যামেরা তোলা পৃথিবীর সাদা কালো ছবি।
ছবি: Twitter/NasaArtemis

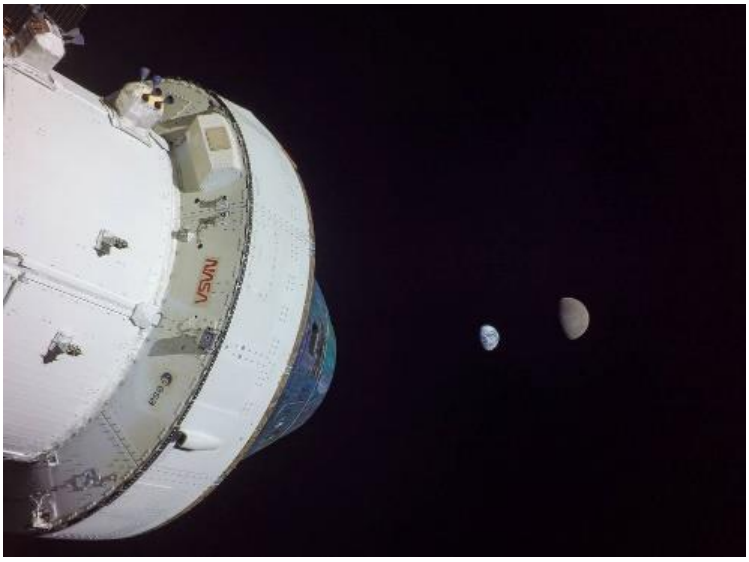

অরিয়ন, চাঁদ, পৃথিবী একই সাথে।
ছবি: Nasa

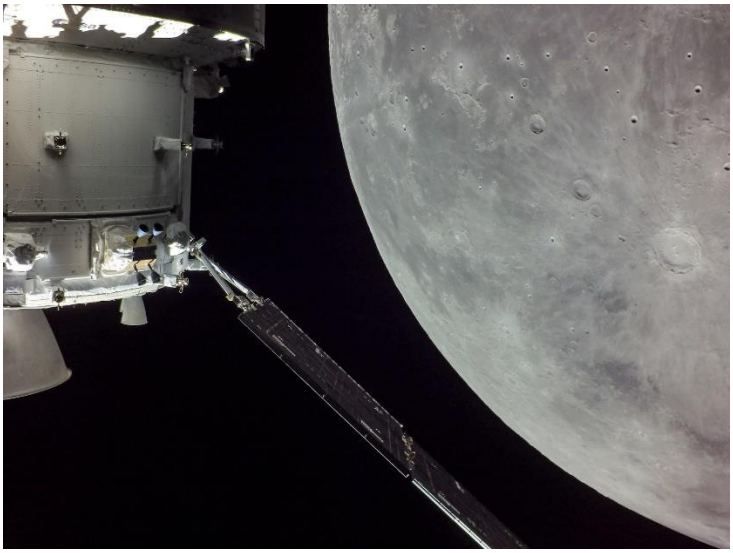

চাঁদের সাথে সেলফি। ছবি: Nasa

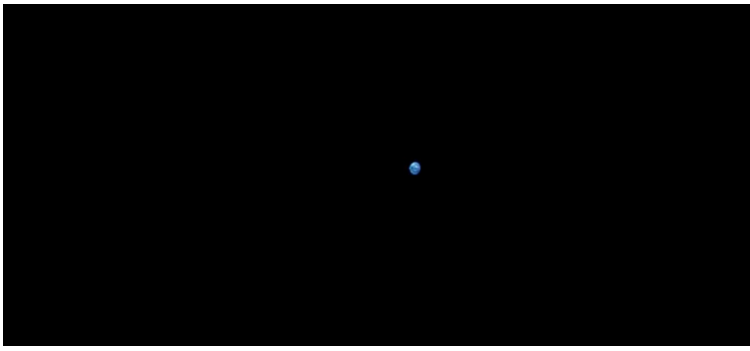

"Pale blue dot" পৃথিবী অন্ধকারে অতিক্ষুদ্র দেখাচ্ছে। পৃথিবী হতে ২৭০০০০ মাইল দূরের ছবি। ছবি: twitter/NasaArtemis

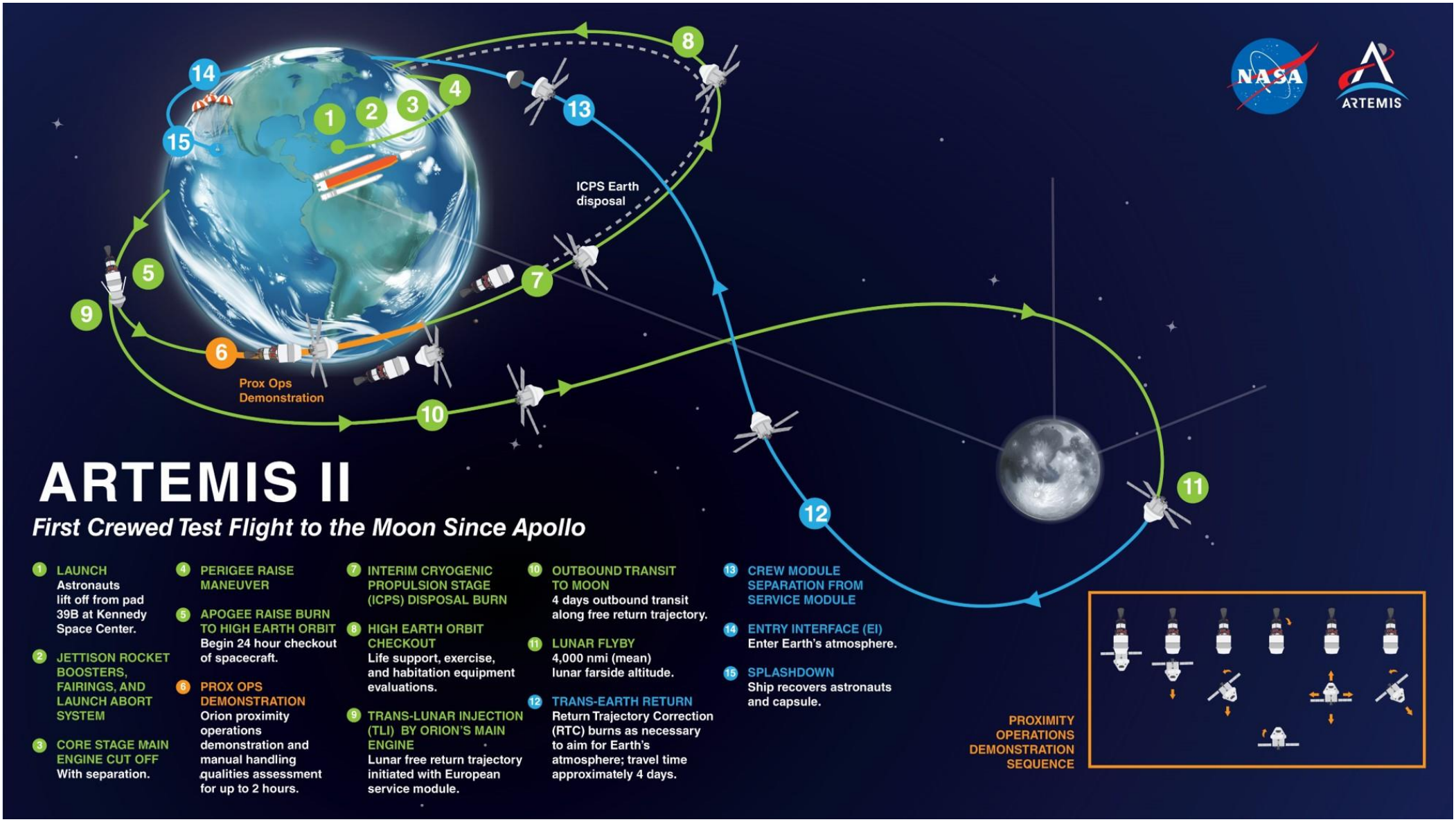

আর্টেমিস ২ এর যাত্রাপথ। ছবি: NASA

পরবর্তী আর্টেমিস মিশনগুলো

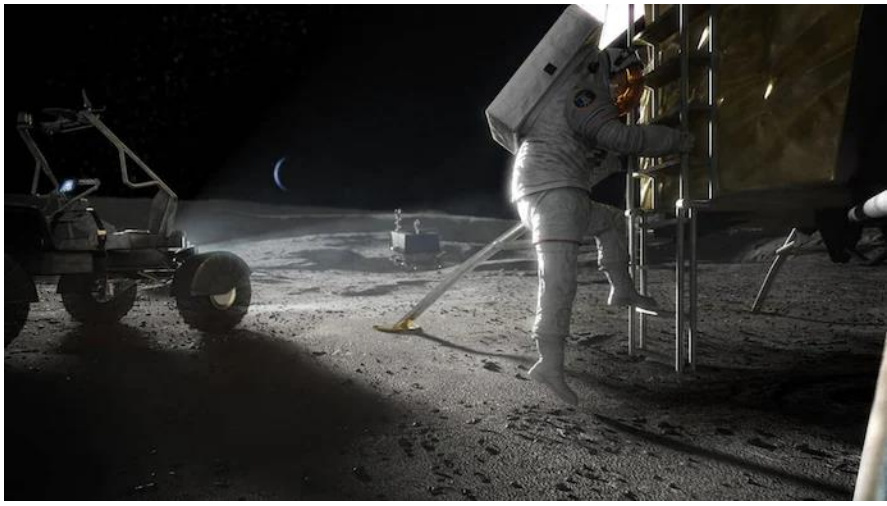

আর্টেমিস ২

এটা হবে নভোচারীদের নিয়ে এই মিশনের প্রথম যাত্রা। মানুষ এখন পর্যন্ত চলা মহাকাশ যাত্রার সবচেয়ে দূরের অংশে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

এসএলএস রকেটের উড্ডয়নের পর, চারজন নভোচারী অরিয়ন স্পেইসক্রাফটকে চাঁদের ৭৪০২ কি.মি. দূরে নিয়ে ফ্লাইবাই করবে এবং পৃথিবীতে ফিরে আসবে।

এই মিশন ৮-১০ দিন দীর্ঘ হবে, এবং প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ ডেটা মিশন থেকে সংগ্রহ করা হবে।

আর্টেমিস - ৩

চন্দ্রযাত্রার তৃতীয় মিশনে ১৯৭২ সালের অ্যাপোলো ১৭ মিশনের পর আবার মানুষ চাঁদের বুকে পা রাখতে চলেছে। আর্টেমিস ২ এর সকল বিষয়কে লক্ষ্য রেখে চারজন নভোচারী এগিয়ে চলবে। এই সময় মূল স্পেইসক্রাফট থেকে আলাদা হয়ে অরিয়ন মডিউল দুইজন নভোচারী সহ চাঁদের বুকে নামবে, দক্ষিণ মেরুতে। এই অংশটায় এর আগে মানুষ কখনও যায়নি। এবারের যাত্রা ৩০ দিন স্থায়ী হবে।

নভোচারীরা চাঁদের বুকে এক সপ্তাহ থাকবেন। এই সময়ে বিভিন্ন গবেষণা চালাবেন, চাঁদের বরফের স্যাম্পল নেবেন। ১৯৭১ সালে প্রথম বারের মতো চাঁদে বরফ শনাক্ত হয়। দক্ষিণ মেরু কয়েক বিলিয়ন বছর ধরে সূর্যের বিপরীতে থাকায় ধারণা করা হয় এখানে মিলিয়ন মিলিয়ন গ্যালন পানি পাওয়া সম্ভব। হয়তো সৌরজগত সৃষ্টির আদি অবশিষ্টাংশ অরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে এই অঞ্চলগুলোতে।

সোর্স:

স্মিথসোনিয়ান ম্যাগাজিন
আর্থস্কাই.কম
এনপিআর.কম
উইকিপিডিয়া
নাসা
আরজিএম.কম
ইসা.ইনট
সায়েন্স নিউজ
বিবিসি ফিউচার
নেচার
বিজ্ঞানচিন্তা

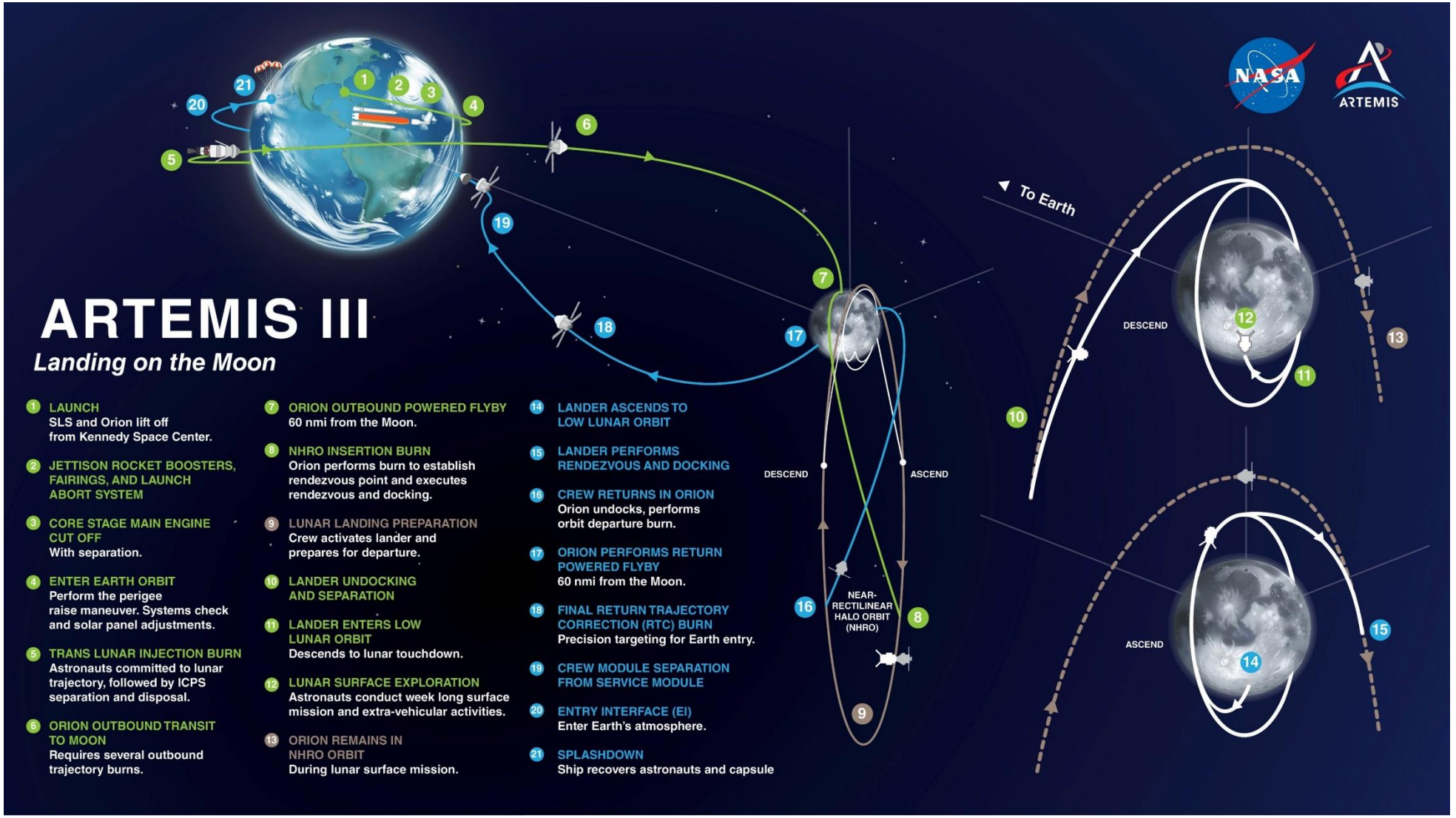

আর্টেমিস ৩ এর যাত্রাপথ। ছবি: NASA

লাল চাঁদের রহস্য সমাধান

মোঃ আক্তারুজ্জামান
শিক্ষার্থী, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ,
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষের মনে জাগা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য দাঁড় করানো হয়েছিল নানা ধরনের ব্যাখ্যা। হোক সে মহাজাগতিক কিংবা বাস্তব জীবন ঘনিষ্ঠ। তেমনই এক ঘটনার নামচন্দ্রগ্রহণ। আজকের মূহুর্তে দাঁড়িয়ে সহজেই বলে দেওয়া যায় চন্দ্রগ্রহণ কেন হয়, কীভাবে হয়? সঠিক ব্যাখ্যা আমাদের হাতের মুঠোয়। কিন্তু আজ থেকে বহু বছর আগের সভ্যতাগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, চন্দ্রগ্রহণ কিংবা সূর্যগ্রহণ তাদের কাছে কোনো সহজ ব্যাপার বা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। ঘটনাগুলোর সাথে জড়িত ছিল তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য। বিভিন্ন জাতি বিভিন্নভাবে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে চন্দ্রগ্রহণকে।

ইনকাদের কাছে চন্দ্রগ্রহণ আসত এক ভয়াল রূপ নিয়ে। চন্দ্রগ্রহণ শুরু হলে যখন পৃথিবীর ছায়া, ধীরে ধীর চাঁদকে গ্রাস করা শুরু করত, তখন তারা মনে করত যেন একটি জাগুয়ার (Jaguar) চাঁদকে গিলে ফেলছে। তাদের বিশ্বাস ছিল, জাগুয়ারটি চাঁদকে খেয়ে ফেলার পর পৃথিবীকে আক্রমণ করবে। তাই জাগুয়ারের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে তারা এক অভিনব উপায় অবলম্বন করত। ইনকারা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিত যাতে ভয় পেয়ে জাগুয়ারটি চলে যায়। তারা তাদের পোষা প্রাণীদের (কুকুর) দিয়ে আওয়াজ করাতো। গ্রহণ যতক্ষণ স্থায়ী হতো ততক্ষণ চলত তাদের এই আচার। যখন ধীরে ধীরে চাঁদ নিজের অবস্থায় ফিরে আসত, তখন তারা ধরে নিত তাদেরকে ভয় পেয়ে জাগুয়ারটি পালিয়েছে। এভাবে পৃথিবী রক্ষা পেত!

ট্রিনিটি নদীর কোল ঘেঁষে উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ায় বাস করে এক ধরনের উপজাতি। এদের বলা হয় Hupa। হুপা উপজাতির বিশ্বাস মতে চাঁদের ২০ জন স্ত্রী। ২০ জন স্ত্রীর পাশাপাশি চাঁদের রয়েছে অনেক পোষা প্রাণী। এই পোষা প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে পাহাড়ি সিংহ এবং পাহাড়ি সাপ। এরা আবার অনেক ক্ষুধার্ত। চন্দ্র যখন এদের খাবার যোগাড় করতে পারে না, তখনই তারা আক্রমণ করে চাঁদকে। রক্তাক্ত হয়ে যায় চাঁদ। স্বামীর রক্তাক্ত এই অবস্থা দেখে ছুটে আসেন তার ২০ জন প্রিয়তমা। বহু কষ্টে ক্ষুধার্ত প্রাণীদের হাত থেকে বাঁচানো যায় চাঁদকে। ধীরে ধীরে গ্রহণ শেষ হয়। চাঁদ হয়ে ওঠে সুস্থ।

চীনের পূরাণ অনুসারে চন্দ্রগ্রহণ কিংবা সূর্যগ্রহণ ঘটার জন্য দায়ী একটি স্বর্গীয় কুকুর অথবা ড্রাগন। এই ড্রাগনটি যখন চাঁদকে গিলে নেয়, তখনই গ্রহণ শুরু হয়। এই অবস্থায় ড্রাগন তাড়িয়ে চাঁদকে মুক্ত করার জন্য চীনারা বাদ্যযন্ত্র বাজানো শুরু করত। বাদ্যযন্ত্রের বাজনার তীব্রতার তাণ্ডবে একসময় ড্রাগনটি পালিয়ে যেত। চন্দ্র শোভা পেত আগের মতোই।

চিত্র : চন্দ্রগ্রহণের সময় আলোক বিচ্ছুরণের ফলে চাঁদ লাল দেখায়। এজন্য একে ব্লাড মুন ডাকা হয়। (স্বত্ব: স্পেস ডট কম)

হিন্দু পুরাণ মতে রাহু নামক অসুর যখন ছদ্মবেশে দেবতাদের আসরে অমৃত পান করতে যায়, তখন চন্দ্র ও সূর্য তার ছদ্মবেশ চিনে ফেলে। রাহুর এহেন অপরাধের জন্য ব্রহ্মা তার মাথা থেকে ধড় আলাদা করার আদেশ দেন। কিন্তু ততক্ষণে রাহু অমৃত পান করে ফেলার কারণে রাহু জীবিতই থেকে গেল কিন্তু মাথা ও দেহ বিচ্ছিন্ন হিসেবে। তখন থেকেই রাহুর সাথে সূর্য ও চাঁদের বৈরিতা। এই বৈরিতার ফলশ্রুতিতে রাহুর মস্তক ভাগ যখন প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সূর্য, চন্দ্রের কাছে ছুটে যায়, তখন সূর্য, চাঁদকে গিলে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু রাহুর তো পেট নেই। তাই সূর্য, চাঁদ গিলে ফেললেও সেগুলো গলার কাটা অংশ দিয়ে বেরিয়ে আসে। এই মুখে নেওয়া থেকে বেরিয়ে আসার সময়টাকেই হিন্দু পুরাণে গ্রহণ বলা হয়।

এছাড়া আরও অনেক উপকথা আছে। মেসোপটেমিয়ানরা চন্দ্রগ্রহণকে তাদের রাজার প্রতি অসম্মান মনে করত, রাজাকে লুকিয়ে রেখে অভিনব উপায়ে চন্দ্রগ্রহণের সময়টি অতিবাহিত করত তারা। এ সময় আসল রাজাকে তারা লুকিয়ে রাখত অথবা সাধারণ নাগরিকের বেশভূষায় সজ্জিত করত। অন্যদিকে একজন সাধারণ লোককে নকল রাজা সাজানো হতো। এভাবে চাঁদকে ধোঁকা দিতো তারা। চন্দ্রগ্রহণ শেষ হলে বেশিরভাগ সময় নকল রাজাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হতো এবং আসল রাজাকে আবার সিংহাসনে বসানো হতো।

অ্যাজটেক সভ্যতা পৃথিবীর ইতিহাসে জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। চন্দ্রগ্রহণের সময় নানা ধরনের বিধি নিষেধ ও পালন করত তারা (যা আজও বহু দেখা যায়)। এছাড়া ভাইকিং, মায়ানদেরও ছিল নিজস্ব পদ্ধতি এবং আচার।

আফ্রিকার টোগো (Togo) এবং বেনিন (Benin) অঞ্চলের বাটাম্বালিম্বা (Batammaliba) জাতির লোকেরা চন্দ্রগ্রহণকে সূর্য এবং চন্দ্রের যুদ্ধ বলে মনে করত। তখন লোকেরা যুদ্ধ থামানোর উদ্দেশ্য নিয়ে এক জায়গায় সমবেত হতো। একসময় যুদ্ধ থেমে যেত।

এরকম বহু উপকথা রচিত হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে। তবে আজকের পোস্টের উদ্দেশ্য নিছকই এসব কুসংস্কার নিয়ে না। প্রাচীন মানুষের কাছে যে ব্যাপারটি সবচেয়ে ভয়ের ছিল, সেটি হলো চাঁদের রক্তিম রূপ ধারণ করা। পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ কেন হয় তা আমরা প্রায় সবাই জানি। তাই এ ব্যাপারটি বলা বাহুল্য মনে হতে পারে। মূল প্রশ্ন হলো, পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদ রক্তের মতো লাল হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে আমাদের পৃথিবীতেই। পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ে। এসময় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এর ভিতর দিয়ে আলোকরশ্মি গমন করে। এসময় বায়ুমন্ডলের ধুলিকণাসহ বিভিন্ন উপাদান থাকার ফলে আলো বিচ্ছুরিত হয়। আলো বিচ্ছুরণ যখন হয় তখন কোনো বড়ো প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন আলো না হলেও আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কাছাকাছি দৈর্ঘ্যের সমান বহু প্রতিবন্ধকের মুখোমুখি হয়। যার ফলে প্রযোজ্য হয় রিলের (Rayleigh) বিচ্ছুরণ সুত্র।

রিলের বিচ্ছুরণ সুত্রের মূলনীতি এমনভাবে লেখা যায়:

বিচ্ছুরণের মাত্রা আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চতুর্ঘাতের ব্যাস্তানুপাতিক। অর্থাৎ সহজ ভাষায় তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত কম, আলোক বিচ্ছুরণ তত বেশি।

আমরা জানি, সূর্যের আলোর মধ্যে রয়েছে বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল বর্ণের আলোর সংমিশ্রণ। এর মধ্যে বেগুনী আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মান সবচেয়ে কম। যার ফলে বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে গমন করার সময় বেগুনি বর্ণের আলো বেশি পরিমাণ বিচ্ছুরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। লাল বর্ণের আলোক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মান বেশি। ফলে অন্যান্য আলোর তুলনায় কম বিচ্ছুরিত/কম ছড়িয়ে পড়ে গমন করতে পারে। এই লাল আলো চাঁদের বুকে আপতিত হয় এবং আপতিত আলোর নির্দিষ্ট শতাংশ আমাদের চোখে প্রতিফলিত আলোকরূপে আসলে আমরা চাঁদকে লাল দেখতে পাই। সূর্য ডোবা কিংবা ওঠার সময় দিগন্ত লাল হয়ে যাওয়ার কারণও একই। শুধু পার্থক্য হলো, সূর্য ডোবা বা ওঠার সময় আলো সরাসরি চোখে আসলেও পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের সময় প্রতিফলিত আলো চোখে আসে।

পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদ যে সবসময় রক্তিম থাকে তা নয়। কমলা, কমলা-হলুদ ইত্যাদি রঙেরও হয়। মূলত কোন রং হবে সেটা নির্ভর করে বায়ুতে কোন উপাদান আছে কী পরিমানে তার ওপর। পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণে কী রং দেখাবে সেটা পরিমাপ করার জন্য Danjon scale নামে এক পরিমাপ পদ্ধতি আছে। এটা এখন আলোচনা করব না সামনের জন্য তুলে রাখলাম বিস্তৃত আলোচনার জন্য।

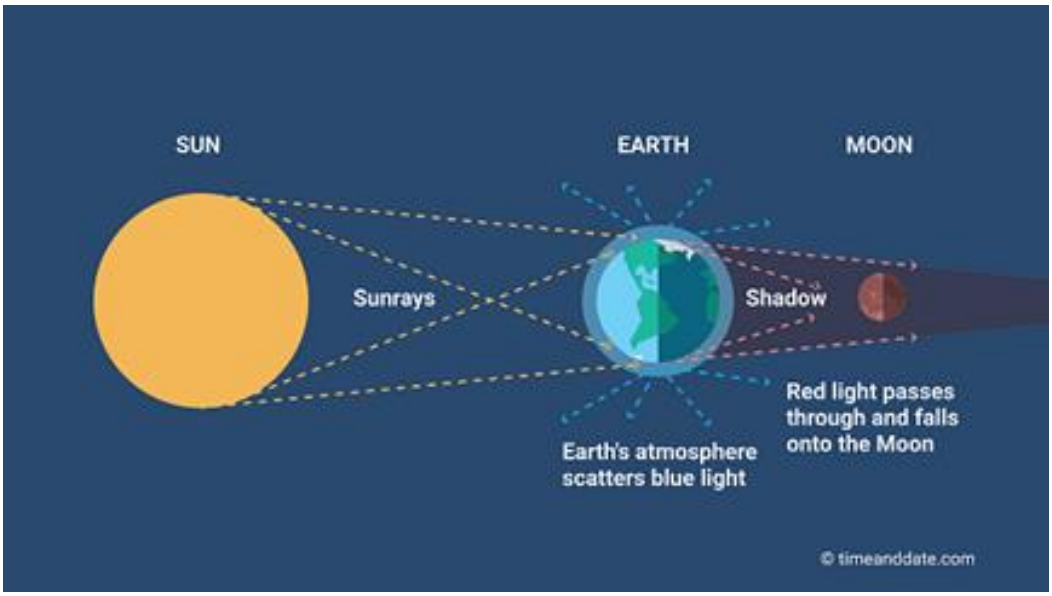

চিত্র: রিলের সূত্র অনুসারে, যে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি সে আলো তত কম বিচ্ছুরণ করে। দৃশ্যমান আলোর মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি। তাই এটি কম বিচ্ছুরিত হয় ও চাঁদের পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে। সেই লাল আলো প্রতিফলিত হলে আমরা দেখতে পাই। তাই চাঁদকে তখন লাল দেখায়। (ছবি স্বত্ব: টাইমএন্ডডেইট ডট কম)

শার্লক হোমসকে সাহায্য করো

শার্লক হোমস আর তার সহযোগী ওয়াটসন একবার একটি কবরস্থানে হাটার সময় একটা কবরের দিকে তাদের চোখ পড়ল। কবরের এপিটাফে তারা নিচের মতো কিছু সাংকেতিক বর্ণ দেখতে পেল। সাংকেতিক বর্ণগুলোর মাধ্যমে লুকানো আছে একটু গুপ্ত কথা। কী সেই কথা? শার্লক হোমস আর ওইয়াটসনকে সেই গোপন মর্মার্থ খুঁজে বের করতে সাহায্য করতে চাও? তাহলে তোমার সমাধান পাঠিয়ে আমাদের ফেইসবুক পেইজে।

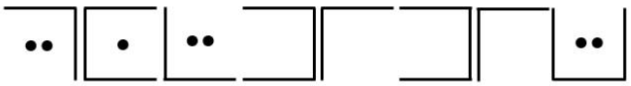

কম্পোজিট ফাংশন : f ’ g দ্বারা আসলে কী বুঝায়?

কে. এম. শরীয়াত উল্লাহ
শিক্ষার্থী, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ,
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

ফাংশন নিয়ে প্রথমে আলোচনা করি। ধরুণ আপনার কাছে একটি মেশিন আছে। মেশিনের একপাশে তুলা দিলে অপর পাশে কাপড় তৈরি হয়ে বের হয়। এখানে মেশিনকে বলা হয় ফাংশন। এটি একটি যন্ত্র। এই ফাংশনের ইনপুট হিসেবে যা যা দেওয়া যায় তা হচ্ছে এর ডোমেন আর মেশিনের আউটপুট হিসেবে যা যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে রেঞ্জ। যেমন উপরে উল্লেখিত মেশিনের ডোমেন হচ্ছে তুলা আর রেঞ্জ হচ্ছে কাপড়। এবার বিষয়টা একটু গাণিতিক দিকে নিয়ে যাই।
$f(x)$ হচ্ছে একটি মেশিন।

এই মেশিনে যদি 2 ইনপুট দেই তাহলে আউটপুট হয় 4।
এই মেশিনে যদি 3 ইনপুট দেই তাহলে আউটপুট হয় 9।
এই মেশিনে যদি 4 ইনপুট দেই তাহলে আউটপুট হয় 16।

মানে ইনপুট আর আউটপুটের মধ্যে সবসময় একটা বর্গের সম্পর্ক আছে।

এই মেশিনে যদি x ইনপুট দেই তাহলে আউটপুট হয় x^2,
এটাকে এভাবে লেখা হয়: $f(x) = x^2$

এখানে ইনপুট হিসেবে যে কোনো নাম্বারই দিতে পারবেন। তাই এর ডোমেন হচ্ছে $\mathbb{R}$ বা বাস্তব সংখ্যার সেট। এখন চিন্তা করেন তো, আমি যতই সংখ্যা দেই এর আউটপুট কেমন হবে? আমি যদি পজিটিভ সংখ্যা দেই তাহলে এর আউটপুট পজিটিভ। আর যদি নেগেটিভও দেই তাহলে একটা স্কয়ার থাকার কারণে সেই নেগেটিভ সাইনটা পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে। তার মানে আমাদের আউটপুট সবসময় পজিটিভই হবে। তাই এর রেঞ্জ হবে $\mathbb{R}_+$

এবার আসি কম্পোজিট ফাংশনে। ধরুণ আপনার কাছে পাশাপাশি দুইটা মেশিন আছে। একটা মেশিন তুলা থেকে কাপড় বানায়। আরেকটা মেশিন সেই কাপড়কে রং করে। এখানে প্রথম মেশিনটাকে $f(x)$ নামক একটা ফাংশন বলতে পারি। আর দ্বিতীয় মেশিনটাকে $g(x)$ নামক আরেকটা ফাংশন বলতে পারি। $f(x)$ এর কাজ কাপড় বানানো। আর $g(x)$ এর কাজ সেই কাপড়কে রঙিন করা।

লক্ষ্য করুন, $f(x)$ এর ক্ষেত্রে ইনপুট তুলা। আউটপুট কাপড়। অন্যদিকে $g(x)$ এর ক্ষেত্রে ইনপুট হচ্ছে কাপড় যা $f(x)$ এর আউটপুট ছিল। তাই আমরা লাস্টের পার্টটা লিখতে চাইলে এভাবে লিখতে পারি $g(f(x))$.

তুলা $\rightarrow$ কাপড় $\rightarrow$ রঙিন কাপড়

$x \rightarrow f(x) \rightarrow g(f(x))$

এখানে যে $g(f(x))$ লিখলাম। মানে ফাংশনের ভিতরে ফাংশন সেটাই হচ্ছে কম্পোজিট ফাংশন। একে $g \circ f$ দ্বারাও প্রকাশ করা হয়।

যেমন ধরেন দুইটা ফাংশন আছে,

$f(x) = x^2$

$g(x) = x+2$

তাহলে $f(g(x)) = f(x+2) = (x+2)^2$

আবার $g(f(x)) = g(x^2) = x^2 + 2$

যদি কখনও দেখেন $f(g(x)) = g(f(x))$ হয়, তাহলে মনে রাখবেন f, g এর বিপরীত ফাংশন বা ইনভার্স ফাংশন।

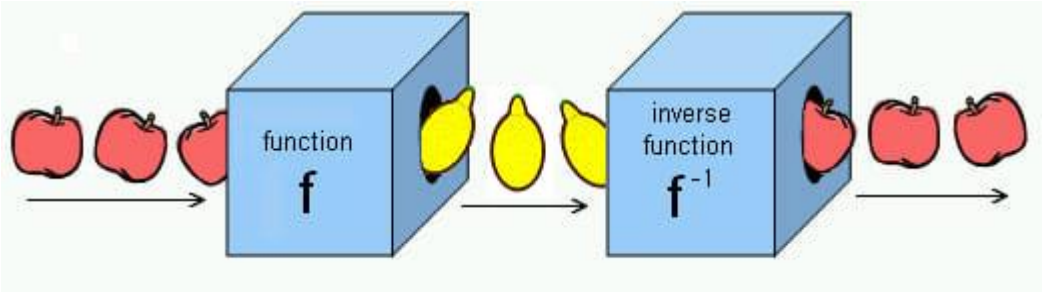

হৃদরোগের চিকিৎসায় কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইড ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি

সামিহা আফসারা ইবনাত, শিক্ষার্থী,
সরকারি প্রমথনাথ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী।

কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইড কী?

হার্ট ফেইলিয়র, অনিয়মিত হার্টবিট ও হৃদপিন্ডের কিছু বিশেষ সমস্যা (atrial fibrillation, atrial flutter) প্রতিরোধে ব্যবহার করা হয় এই কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইড। এটি এক প্রকার ইনোট্রপিক এজেন্ট, যা কার্ডিয়াক পেশীর সংকোচনের শক্তিকে প্রভাবিত করে এবং এর ফলে কার্ডিয়াক আউটপুটকে প্রভাবিত করে। ওষুধের ইতিবাচক ইনোট্রপিক প্রভাব রয়েছে, যদি তা হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের শক্তি বাড়ায়। এটি ফক্সগ্লোভ (Digitalis purpurea, Digitalis lanata) অন্যান্য উদ্ভিদের পাতায় পাওয়া যায় এবং ইনোট্রপিক এজেন্টগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রুপ। যদিও এগুলো অনেক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে, তবে হৃদরোগে কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইডের কার্যকারিতা প্রথম ১৭৮৫ সালে প্রমাণিত হয়। ইংরেজ চিকিৎসক উইলিয়াম উইদারিং হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য ফক্সগ্লোভ পাতার নির্যাস ব্যবহার করেছিলেন। বর্তমানে কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইডের বহুল ব্যবহৃত দুটি যৌগ হলো ডিগক্সিন এবং ডিজিটক্সিন।

হৃদস্পন্দন

হৃদস্পন্দন autonomic nervous system এর দুটি শাখা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। sympathetic nervous system (SNS) ও parasympathetic nervous system (PNS)। sympathetic nervous system(SNS) হৃৎস্পন্দনকে ত্বরান্বিত করতে হরমোন (ক্যাটেকোলামাইনস - এপিনেফ্রাইন এবং নোরপাইনফ্রাইন) নিঃসরণ করে।

হৃৎপিণ্ডের SNS দ্বারা নিঃসৃত নরপাইনফ্রাইন এবং অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি দ্বারা নিঃসৃত এপিনেফ্রিন হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি করে, যেখানে প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ু (PNS) থেকে নিঃসৃত এসিটাইলকোলিন এটিকে হ্রাস করে। Digoxin, atrial fibrillation এ হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইডের কাজ

কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইড মূলত Na+/K+-ATPase (sodium-potassium adenosine triphosphatase) এর সাথে আবদ্ধ হয় এবং যৌগ গঠিত হতে বাধা দেয় (...that bind to and inhibit Na+/K+-ATPase....)। এটি হৃৎপিণ্ডের কোষের অভ্যন্তরে সোডিয়াম তৈরি করে, সোডিয়াম-ক্যালসিয়াম এক্সচেঞ্জারের ক্যালসিয়ামকে কোষের বাইরে ঠেলে দেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস করে, ফলস্বরূপ সারকোপ্লাজমিক রেটিকুলামে ক্যালসিয়াম তৈরি হয়। অন্তঃকোষীয় ক্যালসিয়াম বৃদ্ধির ফলে একটি ইতিবাচক ইনোট্রপিক প্রভাব দেখা দেয়, যার ফলস্বরূপ হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের শক্তি বৃদ্ধির প্রভাব রয়েছে। কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইড একটি বিশেষ ঝিল্লির এনজাইমের কোনো এক বিশেষ ক্রিয়াকে শক্তিশালী করে, কার্ডিয়াক পেশী সংকোচনের শক্তি বাড়ায় এবং কোষের অভ্যন্তর থেকে সোডিয়াম আয়ন বের করে দেয় বলে করা হয়। এই ওষুধ কোষের অভ্যন্তরীণ থেকে ক্যালসিয়ামকে অবমুক্ত করে, যার ফলে অন্তঃকোষীয় ক্যালসিয়াম বৃদ্ধি পায়। এটি পরবর্তীকালে সংকোচনের শক্তি বৃদ্ধি করে, যেহেতু অন্তঃকোষীয় ক্যালসিয়াম আয়নগুলি পেশী কোষের সংকোচনের জন্য দায়ী। ডিগক্সিন Na+K+ ATPase এনজাইমের একটি রিসেপ্টর সাইটের সাথে আবদ্ধ হয়, যা কোষের ঝিল্লি জুড়ে সোডিয়াম এবং পটাসিয়াম বিনিময়ের কাজকে বাঁধা দেয়।

তবে বর্তমানে কিছু গবেষণার আলোকে বলা হচ্ছে যে, কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইডগুলোর Na+/K+-ATPase-এর ক্রিয়াকলাপ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেলুলার প্রক্রিয়াগুলো নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিভিন্ন রোগে যৌগগুলির থেরাপিউটিক ভূমিকা হাইলাইট করে। উল্লেখযোগ্য যে, এই যৌগগুলো ক্যান্সার থেরাপিতে ব্যবহার করতে গবেষণা চলছে এবং গ্লাইকোসাইড-ভিত্তিক অ্যান্টিক্যান্সার ওষুধের ফার্স্ট জেনারেশনের বর্তমানে ক্লিনিকাল ট্রায়াল চলছে।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

প্রতিটি ঔষধের মতো কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইডের কিছু ক্ষতিকর দিক রয়েছে। কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইডের অবশ্য ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। এর মধ্যে রয়েছে electrical impulse সঞ্চালনকে ব্লক করার প্রবণতা রয়েছে, যা অ্যাট্রিয়া থেকে হার্টের ভেন্ট্রিকেলে (হার্ট ব্লক) যাওয়ার সময় সংকোচন ঘটায়। কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইডগুলিরও একটি অস্বাভাবিক কার্ডিয়াক রিদম তৈরি করার প্রবণতা রয়েছে, বিশেষত যে কোষগুলি ছন্দবদ্ধভাবে হৃদস্পন্দন বজায় রাখে সে স্থানে। ফলে হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক পেসমেকার অঞ্চল ব্যতীত অন্য জায়গায় electrical impulses তৈরি হয়। এই অনিয়মিত electric impulse এর ফলে ectopic হার্টবিট হয়, যা স্বাভাবিক কার্ডিয়াক ছন্দের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। মাঝে মাঝে ectopic heartbeat হৃৎপিণ্ডের পাম্পিং ক্রিয়া বন্ধ করে দিতে পারে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে মৃত্যু ঘটে। যেহেতু থেরাপিউটিক এবং গ্লাইকোসাইডের বিষাক্ত ডোজগুলির মধ্যে নিরাপত্তার মার্জিন তুলনামূলকভাবে কম সেগুলি অবশ্যই সাবধানে ব্যবহার করা উচিত।

কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইড ব্যবহারের কারণে কার্ডিয়াক রিদমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এটির

কারণ মূলত আংশিকভাবে ডিপোলারাইজেশনের ফলে এবং আংশিকভাবে অন্তঃকোষীয় ক্যালসিয়াম বৃদ্ধির ফলে ঘটে। এছাড়াও গ্লাইকোসাইডগুলোর বমি বমি ভাব এবং ক্ষুধা হ্রাস করার প্রবণতা রয়েছে। কারণ ডিগক্সিন এবং ডিজিটক্সিন এর plasma এর অর্ধ-জীবন তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ (যথাক্রমে দুই এবং সাত দিন), এবং এগুলো শরীরে জমা হতে থাকে। ফলে, সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে । হার্ট ফেইলিউর রোগীদের ক্ষেত্রে সাইনাস নোডে ডিগক্সিনের একটি নেতিবাচক ক্রোনোট্রপিক প্রভাব রয়েছে ও এটি কার্ডিয়াক রেট হ্রাস করে।

কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইডগুলি কোষের অভ্যন্তর থেকে সোডিয়াম আয়ন বের করে দেয় এমন একটি ঝিল্লি এনজাইমের ক্রিয়াকে আবদ্ধ করে এবং বাঁধা দিয়ে কার্ডিয়াক পেশী সংকোচনের শক্তি বাড়ায় বলে বিশ্বাস করা হয়। এই ওষুধগুলি অভ্যন্তরীণ স্টোর থেকে ক্যালসিয়ামের মুক্তিকেও উন্নত করে, যার ফলে অন্তঃকোষীয় ক্যালসিয়াম বৃদ্ধি পায়। এটি পরবর্তীকালে সংকোচনের শক্তি বৃদ্ধি করে, যেহেতু অন্তঃকোষীয় ক্যালসিয়াম আয়নগুলি পেশী কোষের সংক্ষিপ্তকরণ শুরু করার জন্য দায়ী।

অধিকন্তু, কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইডের উচ্চমাত্রায় গ্রহণের ফলে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদির ইলেক্ট্রোলাইট ভারসাম্যহীনতা হতে পারে। উপরন্তু, নির্দিষ্ট কিছু ওষুধের একযোগে ব্যবহার রক্তে ডিগক্সিনের মাত্রা বাড়াতে পারে। এই ওষুধগুলোর মধ্যে রয়েছে মূত্রবর্ধক, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, অ্যামিওডারোন, সাইক্লোস্পোরিন, কুইনিডিন এবং ননস্টেরয়েডাল অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগস (NSAIDs) ইত্যাদি। অবশেষে, রেনাল ফাংশন হ্রাসের ফলে সিরাম ডিগক্সিনের মাত্রাও বৃদ্ধি পেতে পারে, কারণ ডিগক্সিন কিডনির মাধ্যমে নির্গত হয়।

তথ্য সুত্র-

[১] Cardiac Glycosides: What Are They, What Are They Used For, How Do They Work, Side Effects, and More | Osmosis

[২] Cardiac glycoside overdose: MedlinePlus Medical Encyclopedia

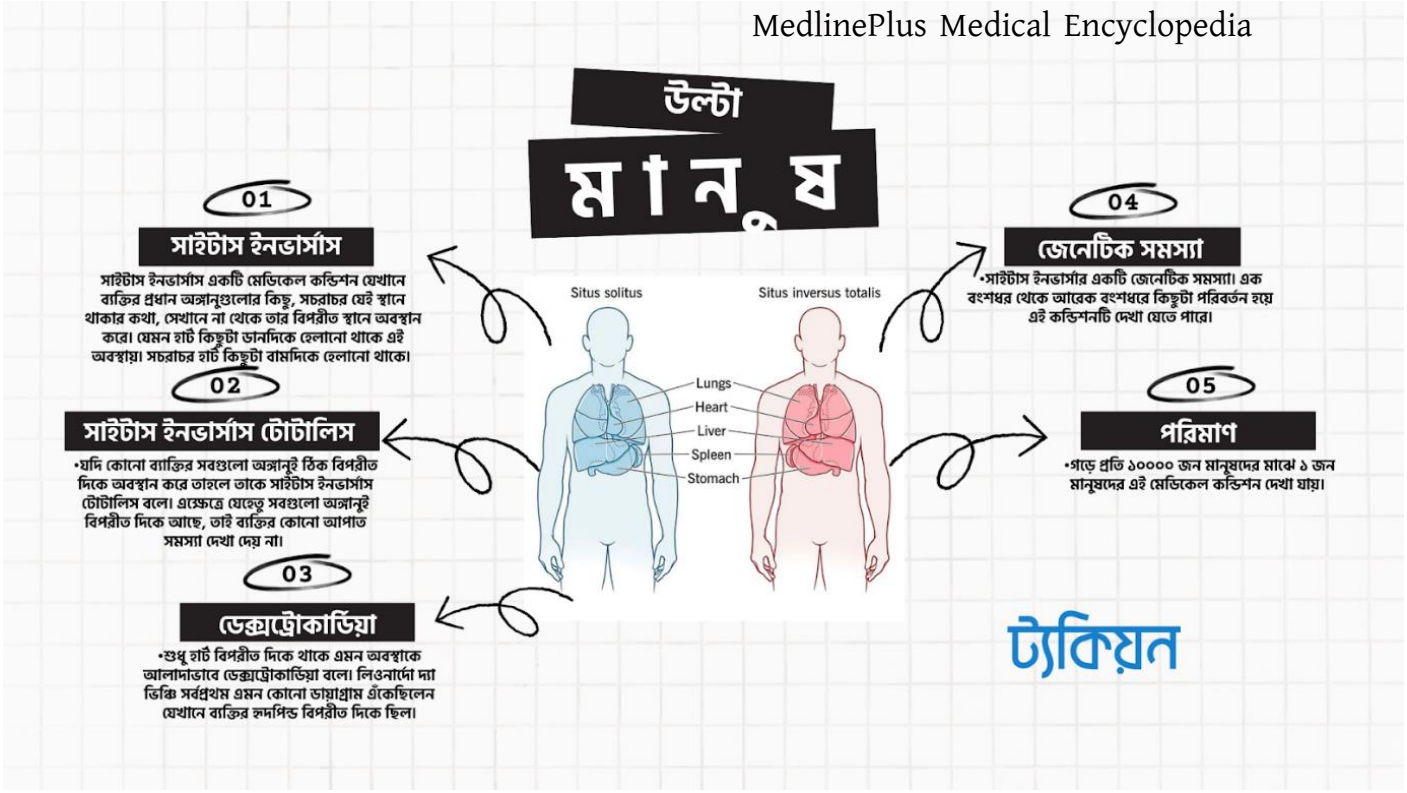

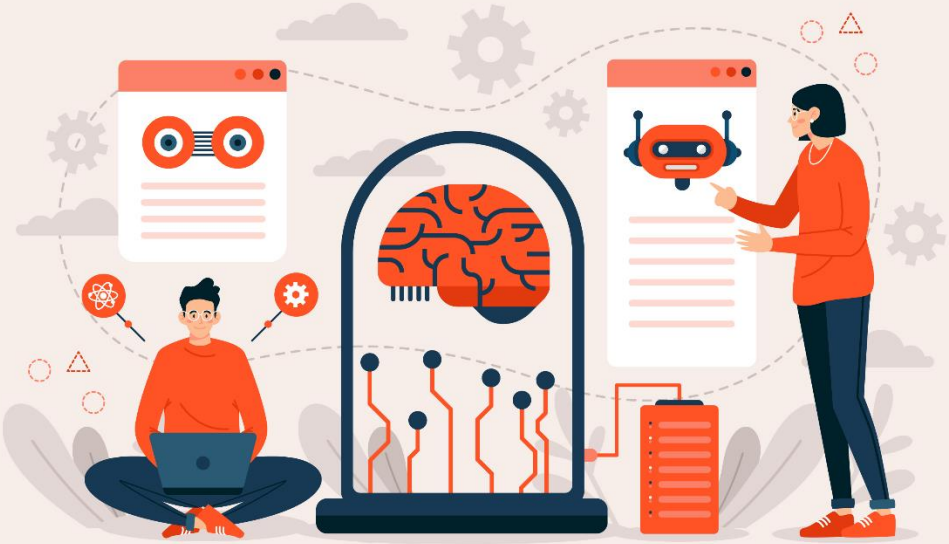

'Machine Learning' জিনিসটা আসলে কী!?

মোঃ সিফাত হাসান
খুলনা প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

২০২১ সাল! আধুনিক যুগ, বিজ্ঞানের যুগ, প্রযুক্তির যুগ, মানুষের Xoops! কম্পিউটারের যুগ। আরও না জানি কী কী নাম দেওয়া হচ্ছে। আমরা কম্পিউটারকে আধুনিক বানাচ্ছি নাকি কম্পিউটারকে উন্নত হতে দেখে আমরা আধুনিকতার পেছনে ছুটছি, সেটাই আমরা অনেকেই বোঝে আসছে না, যেটা সত্যিই আনন্দ সংবাদ!

আগে আমাদের এটা কল্পনাতেই ছিল না যে কম্পিউটারও একদিন উচ্চশিক্ষিত হবে তথা নিজে থেকে কিছু দেখলে চিনতে পারবে, আমাদের সাথে কথা বলতে পারবে, আবার রাত-দিন মাসের পর মাস, বছরের পরবছর বেগার খাটতে পারবে (মাইন্ড করা ছাড়া)।

কী হচ্ছে চারিদিকে? কীভাবে কম্পিউটার পারছে আমাদের অভ্যাস বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে, কখন কোন রাস্তায় চলাচল নিরাপদ তা বলে দিতে, কখন কোথায় আবহাওয়া কেমন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তা জানাতে, বিভিন্ন জিনিসকে ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে, আমাদের সাথে কথা বলতে, ডিজিটাল জগতের যন্ত্রের গোপন কুঠুরি থেকে আমাদের চাহিদা মাফিক ফাইফরমাশ খাটতে? এত কিছু তাকে কে শেখাল, কীভাবে শেখাল? অনেক প্রশ্ন! উত্তর কী আছে, নাকি সবটাই জাদু!?

নাহ! এসবের কোনোটাই মোটেও জাদু নয়; এর সবটাই গাণিতিক, সবটাই যান্ত্রিক! Computer তথা Machine -কে শেখানোর এই প্রক্রিয়ার নামই হলো 'Machine Learning'।

আজ আমরা এটা নিয়েই সামান্য একটু আলোচনা করব, যাতে পরবর্তীতে 'Google Assistant' বা তার বন্ধু-বান্ধবরা আপনাকে তাদের উচ্চশিক্ষার ঝলক দেখিয়ে Depression -এ ফেলতে না পারে।

কম্পিউটারকে শিখিয়ে কী লাভ?

ধরুণ - আপনি অনেক কষ্টে এমন একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম লিখলেন যেটা কুকুর আর বিড়াল জাতীয় প্রাণীদের দেখলেই চিনতে পারে। এখন চাচ্ছেন 'হংসচঞ্চু' -কেও একটু পরিচয় করিয়ে দেবেন। কী করবেন? এই আজব প্রাণীর জন্য আরেকটি প্রোগ্রাম লিখবেন! এভাবেই যদি নতুন ধরণের ডেটা -এর জন্য বারবার কষ্ট করতে হয়, তাহলে তো সমস্যা। এই সমস্যা থেকে বাঁচার জন্যই এমন অ্যালগরিদম দরকার যেটা নতুন ডেটার ভিত্তিতে নিজের মডেলকে আপগ্রেড করতে পারবে, নতুন করে নিজেকে ট্রেইন করতে পারবে। তবে, এর জন্য দরকার প্রচুর পরিমাণ ডেটা খাওয়ানো, মানে এই যে ডেটাবেস থেকে কম্পিউটার এসব শিখবে এবং তথ্যগুলোকে যুক্ত করতে পারবে। যেখানে তথ্য যথাসম্ভব বেশি রাখতে হবে। আর এটা তেমন কঠিন কাজ না। এই যেমন, আমরা বেশিরভাগই 'Google Search Engine' ব্যবহার করি। আমরাই Google -কে বিভিন্ন প্রশ্ন করে করে করে তাকে শেখার সুযোগ করে দিয়েছি, যার ফলাফলস্বরূপ আজ অনেকে Google -কে নিজের চেয়েও বেশি স্মার্ট মনে করে!

কম্পিউটারকে আবার শেখায় কীভাবে?

ভালো প্রশ্ন! ছোটোবাচ্চারা কীভাবে শেখে? যে বাচ্চা কুকুর চেনে না, তার সামনে অনেক প্রজাতির কুকুর আনলে সেগুলোকে সে আলাদা ধরণের প্রাণীই ভাববে। তাই তাকে শেখানো হয় - এদের মাঝে এই এই পার্থক্য থাকলেও আসলে তারা সবাই 'কুকুর' নামের প্রাণী। আবার তাকে বিড়াল ও কুকুরের মাঝে পার্থক্য দেখালে বুঝবে যে আগের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলে একই প্রাণী, তবে এবার পার্থক্য আছে এবং একই সাথে ভিন্ন প্রাণী; নতুন প্রাণীটির নাম 'বিড়াল'। এভাবে, বাচ্চাটা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠবে আর চোখের সামনে যা যা দেখবে, কানে যা যা শুনবে, অন্যান্য ইন্দ্রিয় দিয়ে যা যা অনুভব করবে তথা ইনপুট হিসেবে নিজের মাঝে নেবে। এরপর এত এত তথ্য ক্লাসিফাই করা থেকে শুরু করে তাদের মাঝে সম্পর্ক বুঝতে শিখবে ও অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগাতেও শিখবে; কোথাও ভুল করলে ভুল শুধরোবার অনেক রাস্তা আছে! সেটা হতে পারে — নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, কেও হাতে ধরে শিখিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে বা ভুল ধরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে, নিজে কোনো বই পড়ে বা যে-কোনোভাবে নিজে নিজে পড়াশোনা করে শেখা।

তো যেটা বললাম — এই চার ধরণের Learning Method-কে চারটি Cute নাম দেওয়া হয়েছে —

Supervised Learning: কম্পিউটারকে একইসাথে ডেটা এবং সেই ডেটা কীভাবে পরস্পরে সংযুক্ত এবং তাদের শ্রেণীবিন্যাস সব প্রোগ্রাম করে দেওয়া হয়। যেমন: অনেকগুলো Spam Email এর স্যাম্পল একত্র করে প্রোগ্রাম করা হলো যে, এ ধরণের বা কোনো মেইলে কিছু পেলেই সেটাকে Spam হিসেবে চিহ্নিত করে 'Spam Folder' -এ রেখে দেবে।

Unsupervised Learning: এক্ষেত্রে আগে থেকেই একটা কম্পিউটার অ্যালগরিদম এমনভাবে ডিজাইন করা থাকে, যাতে করে তাকে বৈশিষ্ট্যসহ অনেকগুলো ডেটা দিলে সেগুলো থেকে সে একই ধরণের ডেটাগুলো

আলাদা করে বেশ কয়েকটা ক্লাস্টার (Group) তৈরি করতে পারে; তবে কোনো লেবেলিং করা হয় না! তবে, পরে নির্দিষ্ট ধরণের ডেটা নিয়ে কাজের সময় কম্পিউটার সেটাকে গুলোকে আলাদাভাবে চিনতে পারে।

Semi-Supervised Learning: এটি Supervised আর Unsupervised এর মাঝামাঝি ধরণ। এক্ষেত্রে ট্রেনিং মডেলের কিছু ডেটাকে শ্রেণীকরণ করে দেওয়া হয়, আবার কিছু Data Unclassified বা লেবেল না করা অবস্থায় থাকে।

Reinforcement Learning: এর সহজ সংজ্ঞা - প্যারায় পরে শেখা। ধরুণ: আপনি চশমা পড়া কাউকে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন - 'আন্ধা হো কিয়া?', আর এটা বলার পর কোনো এক কারণে আপনার মুখের ভঙ্গিমা পরিবর্তন হয়ে গেল। তাহলে বুঝবেন - চশমা পড়া লোকদের এরকম প্রশ্ন করা যাবে না। কম্পিউটারও যাতে এভাবে ঠেকে শিখতে পারে, তার জন্য কম্পিউটার গবেষকরা অনেক গবেষণা করে স্পেশালিটি সহ কম্পিউটার অ্যালগরিদম তৈরী করেন।

এটা তো গেলো 'Learning Methods'। মেশিন লার্নিং আসলে কীভাবে ধাপে ধাপে কাজ করে, সেটা এখন দেখব —

Import The Data: শুরুতে ডেটাসেট বা ডেটাবেজ তৈরি করতে হয় যেখানে ছবি, লেখা বা যে উদ্দেশ্যে যে ধরণের প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতে চাই, তার ভিত্তিতে প্রচুর প্রচুর প্রচুর পরিমাণ ডেটা থাকবে। (ডেটাগুলো সাধারণ টেবিল আকারে সাজানো থাকে!)

Clean The Data: এরপর ডেটাগুলো রিফাইন বা ক্লিন করতে হয়। অপ্রয়োজনীয় সবকিছু বাদ দিতে হয় এবং অ্যানালাইসিস করার জন্য মডিফাই করারও প্রয়োজন হতে পারে। যেমন: ছবি বা মুখাবয়ব সনাক্তকরণ প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করার জন্য ছবিগুলোকে সাদাকালো করতে হয়, যাতে সেটাকে নিয়ে অ্যানালাইসিস করার সময় কম্পিউটার রং নিয়ে প্যারা না খায়। (এসব পরিবর্তনের জন্য কোড লিখতে হয়! তবে এসব কাজ সহজ করার জন্য অনেক অনেক 'লাইব্রেরি ফাংশন' আছে; তাই চিন্তার কিছু নেই।)

Split The Data into Training/Test Sets: এরপর রিফাইন করা ডেটার বেশিরভাগ অংশ ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণের এর জন্য রাখা হয় এবং বাকি অংশ টেস্টিং এর জন্য আলাদা 'কনটেইনার' বা সেট-এ রাখা হয়। ট্রেনিং ডেটাসেটে সেটা যত বেশি থাকবে মডেলটি ততই ভালোভাবে প্রশিক্ষিত হবে।

Create A Model: এরপর সেই দুই ধরণের ডেটাসেটের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম প্রয়োগ করে মডেল তৈরি করা হয়; 'ট্রি' বা 'নেটওয়ার্ক' এর মতো যেটাকে পরে ট্রেনিং করা সম্ভব। (এটা নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই, কম্পিউটার ও ডেটা সায়েন্টিস্টরা ইতোমধ্যে অনেক শক্তিশালি সব অ্যালগরিদম তৈরী করেছেন, এখনও কাজ চলছে। আর, এগুলো ব্যবহার করার জন্য অনেক 'লাইব্রেরি' পাওয়া যায়, বিশেষ করে 'পাইথন' প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের তো এসবের অভাব নেই!)

Train The Model: এরপর সেই মডেলকে ট্রেইন করা হয়। (এর জন্যই অ্যালগরিদম (Process) আছে!)

Test The Model (Make Predictions): এরপর সেই Trained Model -কে কাজে লাগিয়ে একই ধরণের এমন ডেটা (ফল, ফুল, প্রাণী, মানুষের মুখ, বয়সের ভিত্তিতে উচ্চতাসহ যে-কোনো Structured Data) এর ভিত্তিতেও ফলাফল পাওয়া যাবে যেটা ঐ ডেটাবেসেই নেই। যেমন: বয়সের ভিত্তিতে উচ্চতার ডেটাবেস থেকে ট্রেনিং মডেল তৈরি করে, সেটাকে টেস্ট করার জন্য ধরুণ এমন বয়স দিলেন, যেটার উচ্চতার মান ডেটাবেসে নেই, সেটাও প্রোগ্রামরটি মডেলের ভিত্তিতে প্রসেস করে উচ্চতা গণনা করতে পারবে; অবশ্যই ১০০% নির্ভুল হওয়ার কথা বলছি না!

Evaluate & Improve: এভাবে বারংবার টেস্ট করা হবে। যদি মনে হয় আরো উন্নতি দরকার আছে, তাহলে অ্যালগরিদমের প্যারামিটারগুলো 'ফাইন টিউনিং' করতে হবে, যাতে ঐ মডেলকে আরও ভালোভাবে ট্রেইন করতে পারে।

অনেকে হয়তো ভাবছেন, এটা কী হলো? এটাই Science, I mean Machine Learning! আর, এটার উপর ভিত্তি করেই 'Artificial Intelligence' এর যাত্রা শুরু হয়েছে, যেটা এখন আমরা জেনে বা না জেনে প্রতিদিনই ব্যবহার করে চলেছি।

Google Maps, Google Translate, Google Assistant, Search Engines, Facebook, Instagram, Twitter, Weather Reports, Disease Diagnosis, Astronomical Data Analysis, Statistics, Data Science, Speech Recognition, Text-To-Speech & Speech-To-Text Engines, Linguistics, Face Recognition, Self Driving Cars, Theorem Proving - সহ অনেক অনেক কাজে 'Artificial Intelligence' তথা 'Machine Learning' এর ব্যবহৃত হচ্ছে, ভবিষ্যতে আরও হবে বলে আশা করা যায়।

কম্পিউটার/রোবট/AI কি আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে?
ক্ষতি করতে পারাটা অসম্ভব না!
তবে, যাতে না পারে, সেজন্য অন্তত এই তিনটি নিয়ম কঠোরভাবে মেনে তাদের তৈরি করতে হবে —

"A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm.
A robot must obey the orders given it by human beings except where such orders would conflict with the First Law.
A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the First or Second Laws."

কিছু অতিরিক্ত তথ্য —

Machine Learning, Artificial Intelligence, Deep Learning - এসব নিয়ে কাজের জন্য কম্পিউটার লাগে, আর তার সাথে লাগে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ যেটা দিয়ে অ্যালগরিদমগুলো বাস্তবায়ন করে, আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন প্রোগ্রাম বানাতে পারি। এরজন্য সবচেয়ে ভালো ল্যাংগুয়েজ হলো 'Python 3'। এটা খুবই সহজ, তবে শক্তিশালি ল্যাংগুয়েজ। পাইথনে এ ধরণের কাজের জন্য 'লাইব্রেরি' এর অভাব নেই; আগে থেকেই সব ঠিকঠাক, আপনি শুধু বুঝে বুঝে ব্যবহার করবেন, That's All.

Some Good Resources —

Articles :

https://www.ibm.com/cloud/learn/machine-learning#:~:text=Machine%20learning%20is%20a%20branch,learn%2C%20gradually%20improving%20its%20accuracy

https://www.expert.ai/blog/machine-learning-definition/

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Machine_learning

Videos :

https://youtu.be/qDbpYUbf3e0

https://youtu.be/ZX2Hyu5WoFg

https://youtu.be/ZqsnZX-p2qs

https://youtu.be/I7yh3vqV3Uo

https://youtu.be/HcqpanDadyQ

https://youtu.be/nKW8Ndu7Mjw

https://youtu.be/5cFUZ03Sbhc

Courses :

https://youtube.com/playlist?list=PLQVvvaa0QuDfKTOs3Keq_kaG2P55YRn5v

https://youtu.be/XIrOM9oP3pA

https://youtu.be/7eh4d6sabA0

Circadian rhythm
একটি জৈবিক ঘড়ি

সানজিদা ইসলাম শেফা
সরকারি প্রমথনাথ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

সার্কাডিয়ান রিদম, দেহঘড়ি বা জৈবিক ঘড়ি। নামটা যেমন ঘড়ির কথা ইঙ্গিত করে, তেমনি এর কার্যপদ্ধতিও ঘড়ির কার্যপ্রণালীর সাথে খানিকটা সংশ্লিষ্ট। তবে বিরাট পার্থক্য এই যে, এই ঘড়িটার অবস্থান এবং কার্যপরিচালনার সদর দপ্তর জীবদেহের অভ্যন্তরীণ। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের যে শারীরিক, মানসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন এবং পরিবর্তনের সাথে প্রাপ্ত অভিযোজন ক্ষমতার জন্য দায়ী এই সার্কাডিয়ান রিদম বা দেহঘড়ি। Circadian শব্দটির উৎপত্তি মূলত ল্যাটিন দুই শব্দ 'circa' এবং 'diēm' থেকে যার আভিধানিক অর্থ 'কাছাকাছি' ('around' or 'approximately') এবং 'দিন'। এই ২৪ ঘন্টার ক্রিয়াশীলতা যদি বাহ্যিক এবং endogenous উভয়ই হয়ে থাকে তবেই একে সার্কাডিয়ান ক্লক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ২৪ ঘণ্টার endogenous কাজকে আরেক নাম diurnal rhythm বলে সম্বোধন করা যায়। আমাদের ঘুমের ধরন, শারীরিক হরমোনজনিত পরিবর্তন, দেহের তাপমাত্রা, খাদ্যাভাসসহ প্রায় সকল দৈহিক নিয়মকানুনের সাথে এক অদ্ভুত যোগসূত্র রয়েছে এই দেহঘড়ির।

সার্কাডিয়ান রিদম যেভাবে কাজ করে:

মূলত প্রায় ২০,০০০ স্নায়ু কোষের সমন্বয়ে গঠিত আমাদের মস্তিষ্কের একটা অংশ সুপারকিয়াজম্যাটিক নিউক্লিয়াস (SCN)। হাইপোথ্যালামাসের মধ্যে অবস্থিত এবং আমাদের সার্কাডিয়ান রিদম পরিচালনার দায়িত্ব এর উপরই। তবে আমাদের জিনগত এবং প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত হলেও বাহ্যিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানও এর কাজকর্মের সাথে সংযুক্ত। সার্কাডিয়ান রিদম একই সাথে এন্ডোজেনাস এবং বাহ্যিক পরিবেশ সংশ্লিষ্ট হওয়ায় বাহ্যিক পরিবেশের অন্যতম প্রভাবক হিসেবে আছে zeitegebers (জার্মান শব্দ যার অর্থ 'সময় দাতা' বা time givers)। যার অন্তর্ভুক্ত হলো সময়, তাপমাত্রা এবং রেডক্স

চক্র। আবার আলো একাধারে আমাদের রাত এবং দিনের জানান দেয়, যার একটা বিরাট প্রভাব আমাদের জৈবিক ঘড়িতে দৈনন্দিন বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

যেমন, সূর্য উদিত হলে আমাদের সচেতন এবং অবচেতন মন পরোক্ষণেই জেনে যেতে পারে যে কখন ঘুম থেকে ওঠার সময় হয়েছে। তেমনি রাত যত ঘনিয়ে আসে, নিশিরাতে আপনার চোখ সংলগ্ন স্নায়ুগুলো আপনার মস্তিষ্ককে জানান দেয় মেলাটোনিন হরমোন উৎপাদন করতে, যা আপনাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। তবে এই ঘুম-জেগে থাকার খেলার ধরণ ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন করে। সেই কারণেই আমাদের ঘুমাতে যাওয়ার এবং ঘুম থেকে ওঠার সময়ের এই ছাঁচটা একেকজনের ক্ষেত্রে একেকরকম।

সার্কাডিয়ান রিদমের কিছু নির্ণায়ক

এই প্রক্রিয়াকে সার্কাডিয়ান বলার ক্ষেত্রে কিছু মানদন্ড রয়েছে, যা পূরণ করা আবশ্যক। নয়তো একে পুরোপুরি সার্কাডিয়ান রিদমের তালিকাভুক্ত করা যাবে না।

প্রক্রিয়াটির একটা এন্ডোজেনাস মুক্ত চলমান সময়কাল (Endogenous free-running period) রয়েছে যা প্রায় ২৪ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। রিদম মূলত স্থির অবস্থায় থাকে (যেমন, কনস্টেন্ট অন্ধকারের ক্ষেত্রে) প্রায় ২৪ ঘন্টা সময়কালের সাথে। স্থির অবস্থায় এই রিদমের সময়কালকে মুক্ত-চলমান সময়কাল বলা হয় যা গ্রীক অক্ষর τ (tau) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এই মানদন্ডের যুক্তি হলো দৈনিক বাহ্যিক সংকেতের সহজ প্রতিক্রিয়া থেকে সার্কাডিয়ান রিদমকে আলাদা করা। রিদমকে এন্ডোজেনাস বলা যায় না যদি না এটি পরীক্ষা করা হয় এবং বাহ্যিক পর্যায়ক্রমিক ইনপুট ছাড়াই অবস্থাতে টিকে থাকে। প্রাণীদের মধ্যে (যারা দিবালোকে সক্রিয় অর্থাৎ diurnal animals), তাদের τ সাধারণভাবে ২৪ ঘন্টার চেয়ে সামান্য বেশি, যেখানে নিশাচর প্রাণীদের (রাতে সক্রিয়), সাধারণভাবে τ ২৪ ঘন্টার চেয়ে কম।

সার্কাডিয়ান রিদম মূলত অনুপ্রবেশযোগ্য। অর্থাৎ বাহ্যিক উদ্দীপনার (যেমন, আলো এবং তাপ) সংস্পর্শে আসার মাধ্যমে রিদম পুনরায় সেট করা যেতে পারে যে প্রক্রিয়াকে entrainment বলে। বিভিন্ন আঞ্চলিক সময়ভেদে ভ্রমণ একজনের জৈবিক ঘড়ির স্থানীয় সময়ের সাথে সমন্বয় করার ক্ষমতাকে চিত্রিত করে। যেমন, একজন ব্যাক্তি সাধারণত তার সার্কাডিয়ান

ঘড়িতে স্থানীয় সময়ের সাথে সমন্বয় করার আগে জেট ল্যাগ অনুভব করেন।

সার্কাডিয়ান রিদম তাপমাত্রার ক্ষতিপূরণ (Temperature compensation) ও প্রদর্শন করে। অন্য কথায় এটা মূলত শরীরবৃত্তীয় তাপমাত্রার একটি পরিসরে সার্কাডিয়ান পর্যায়ক্রম বজায় রাখে। অনেক জীবই তাপমাত্রার বিস্তৃত পরিসরে বাস করে এবং তাপ শক্তির পার্থক্য তাদের কোষের সমস্ত আনবিক প্রক্রিয়ার গতিবিদ্যাকে প্রভাবিত করে। সময়ের ট্র্যাক রাখার ক্ষেত্রে এই কারণে জীবের জৈবিক ঘড়িকে মোটামুটিভাবে ২৪ ঘন্টার পর্যায়ক্রম বজায় রাখতে হবে পরিবর্তনশীল গতিবিদ্যা সত্ত্বেও। এই প্রক্রিয়াকে temperature compensation বলা হয়। Q10 তাপমাত্রা সহগ (Q10 temperature coefficient) এই ক্ষতিপূরণ প্রভাবের একটি পরিমাপ। যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে Q10 সহগ আনুমানিক 1 থেকে যায়, তাহলে রিদমে তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়।

তথ্যসূত্র:
https://www.webmd.com/sleep-disorders/find-circadian-rhythm
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythm

The Monty Hall Problem

মন্টি হল' প্রবলেম

নূর মোহাম্মদ কিবরিয়া

গণিতের বিখ্যাত প্রবলেমগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি প্রবলেম হচ্ছে 'মন্টি হল' প্রবলেম'। লেট'স মেক এ ডিল নামের একটি গেম শো হতে এর উৎপত্তি।
গেম শো'টির হোস্ট মন্টি হলের নাম অনুসারেই এই প্রবলেমের নাম 'মন্টি হল প্রবলেম'। চলুন যেই গেম থেকে মন্টি হল প্রবলেমের জন্ম, সেই গেমটি কী ছিল দেখে নেই।

গেম শো'টিতে স্টেজে ৩ টি বন্ধ দরজা থাকত। যথাক্রমে দরজা - ১, দরজা - ২ ও দরজা - ৩। এই ৩টি দরজার ১টির পিছনে থাকত গাড়ি এবং অন্য ২টির পিছনে থাকত ছাগল। একমাত্র মন্টি হলই জানতেন কোন দরজার পিছনে কী আছে।

দর্শকদের একজন তিনটি দরজা থেকে একটি দরজা বেছে নিতেন। ধরা যাক, দর্শক দরজা - ২ বেছে নিয়েছেন। মন্টি হল' তখন অন্য ২ টি দরজা থেকে একটি দরজা খুলতেন। ধরা যাক, মন্টি দরজা - ৩ খুলেছেন। দেখা গেল দরজা - ৩ এ ছাগল আছে।

মন্টি তখন দর্শককে জিজ্ঞেস করতেন, "আপনি কি দরজা - ২ এ স্থির থাকবেন, নাকি মত পরিবর্তন করে দরজা - ১ বেছে নিবেন? কী করলে আপনার গাড়ি পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে?"

দর্শকের জায়গায় যদি আপনি থাকতেন তাহলে আপনি কী করতেন? যেটা প্রথমে বেছে নিয়েছিলেন সেটাতেই স্থির থাকতেন নাকি মত পরিবর্তন করে অন্যটা বেছে নিতেন?

এই পর্যায়ে অধিকাংশ মানুষ বলবেন, শেষ পর্যন্ত যেহেতু দুইটি বন্ধ দরজা আছে এবং তাদের মধ্যে যে-কোনো একটার পিছনে গাড়ি আছে। তাই যেটাই বেছে নেই না কেন এক কোটি টাকার চেক পাওয়ার সম্ভাবনা ১/২। এখানে সম্ভাবনা বেশি হওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না।

আপাতদৃষ্টিতে এই যুক্তি সঠিক মনে হলেও, গণিত আমাদের বলে দরজা - ২ এর পরিবর্তে দরজা - ১ বেছে নিলেই বরং আপনার গাড়ি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

কি বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে? বিশ্বাস না করাটাই স্বাভাবিক।
যখন এ সমাধানটি সেই সময়কার একটি বিখ্যাত ম্যাগাজিনে (প্যারেড ম্যাগাজিন) প্রকাশিত হয়। আনুমানিক প্রায় ১০,০০০ পাঠক ম্যাগাজিনে চিঠি লিখে দাবি করেন সমাধানটি ভুল। যার মধ্যে আবার ১,০০০ জন পিএইচডি ডিগ্রিধারী ব্যক্তিবর্গও ছিলেন!

তাই কেন মত পরিবর্তন করলে সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তা বুঝতে হলে সমাধানগুলো ভালো করে পড়তে হবে। পাঠকের সুবিধার্থে দুটি সমাধান আলোচনা করা হয়েছে।

সমাধান দেখার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খেয়াল করুন, আপনার একটি দরজা বেছে নেওয়ার পর মন্টি যখন অন্য দুটি দরজা থেকে একটি খুলবে। তখন যদি ঐ দুটি দরজার একটির পিছনে গাড়ি থাকে তাহলে মন্টি কখনোই গাড়িওয়ালা দরজাটা খুলবে না। কারণ গাড়িওয়ালা দরজাটা যদি মন্টি খুলে দেয় তাহলে তো খেলা সেখানেই শেষ। আপনি অবশিষ্ট দুটির মধ্যে থেকে যেটিই বেছে নেন না কেন পাবেন ছাগলই!
তাই কখনই দ্বিতীয় ধাপে গাড়িওয়ালা দরজাটা খুলবে না।

এখন সমস্যাটি গাণিতিক লভাবে সমাধান করা যাক।

সমাধান - ১
লক্ষ্য করুন, আপনার দরজা বেছে নেওয়া দুই ধাপে সম্পন্ন হচ্ছে। প্রথমে তিনটি থেকে একটি এবং পরে দুটি থেকে একটি।

প্রথমে তিনটি থেকে একটি দরজা (এক্ষেত্রে দরজা - ২) বেছে নিলে তার মধ্যে গাড়ি থাকার সম্ভাবনা ১/৩ । অর্থাৎ ৩০০০ বার যদি গেইমটা খেলা হয় তাহলে তার মধ্যে প্রথমে বাছাইকৃত দরজায় (এক্ষেত্রে দরজা - ২) গড়ে ১০০০ বার আপনি গাড়িটি পাবেন। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় ধাপে অন্য দরজাটি (এক্ষেত্রে দরজা - ২ এর পরিবর্তে দরজা - ১) বেছে নিলে যেই ১০০০ বার আপনার গাড়ি পাওয়ার কথা ছিল সেই ১০০০ বার। আপনি দ্বিতীয় ধাপে দরজা পরিবর্তন করায় গাড়ি পাবেন না। অর্থাৎ ৩০০০ বারে গড়ে ১০০০ বার জেতার পরিবর্তে হারা। অতএব দরজা পরিবর্তন কারায় আপনার হারার সম্ভবনা ১/৩।

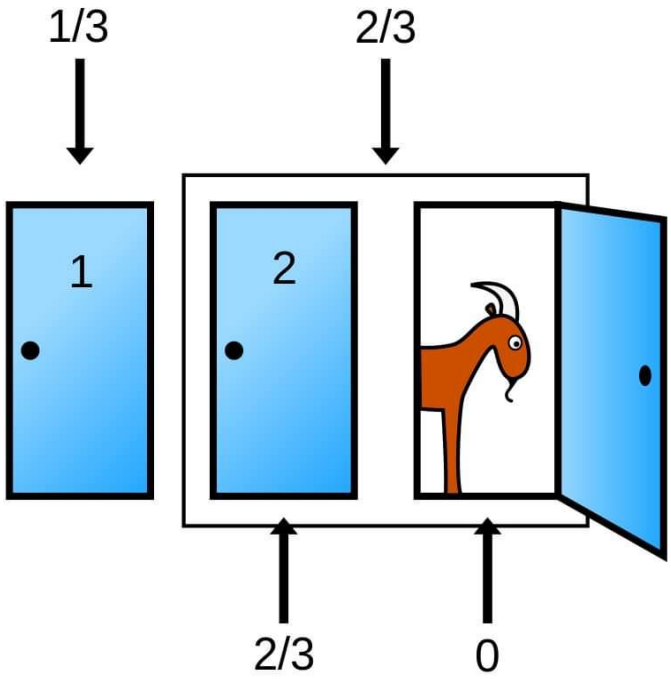

এক মিনিট দাঁড়ান,
হারার সম্ভবনা ১/৩ এর অন্য অর্থ দাড়াচ্ছে জেতার সম্ভাবনা ২/৩! অবিশ্বাস্য!

সরল কথায়, মত পরিবর্তন করায় ৩ বারে গড়ে ১ হারবেন তার মানে অবশ্যই গড়ে অন্য ২ বার জিতবেন।

সুতরাং দরজা পরিবর্তন না করলে গাড়ি পাওয়ার সম্ভাবনা ১/৩ এবং পরিবর্তন করলে গাড়ি পাওয়ার সম্ভাবনা ২/৩।

অর্থাৎ দরজা পরিবর্তন করলে আপনার চেক পাওয়ার সম্ভাবনা দ্বিগুণ হয়ে যায়। তাই আপনার অবশ্যই গেইমের দ্বিতীয় ধাপে দরজা পরিবর্তন করা উচিত (এক্ষেত্রে বাক্স - ২ এর পরিবর্তে বাক্স - ৩ বেছে নেওয়া উচিত)।

এখনো বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও আমি যেভাবে প্রথম ধাপে জেতার সম্ভাবনা থেকে দ্বিতীয় ধাপে হারার হওয়ার সম্ভাবনা বের করেছি। সেভাবে আপনি প্রথম ধাপে হারার সম্ভাবনা থেকে দ্বিতীয় ধাপে জিতার সম্ভাবনা বের করতে পারেন।

যাদের কাছে এখনও বিষয়টি পরিষ্কার হয়নি তারা হতাশ হবেন না। কারণ আমরা এখন মন্টি হল' প্রবলেমের আরেকটি জনপ্রিয় (সহজবোধ্যও বটে) সমাধান দেখব।

সমাধান - ২

তিনটি দরজা আছে এবং তাদের একটির পিছনে গাড়ি আছে। যেহেতু আপনি জানেন না কোন দরজার পিছনে গাড়ি আছে। সেহেতু প্রত্যেকটি দরজার পিছনে গাড়ি থাকার সম্ভাবনা সমান। অর্থাৎ প্রত্যেকটি দরজার পিছনে গাড়ি থাকার সম্ভাবনা ১/৩ করে।

সুতরাং দরজা-২ এর পিছনে থাকার সম্ভাবনা= ১/৩।
এবং দরজা-১ অথবা দরজা-৩ এর পিছনে গাড়ি থাকার মোট সম্ভাবনা = ১/৩ +১/৩ = ২/৩।

গেমের দ্বিতীয় ধাপে মন্টি দরজা - ৩ খুলে

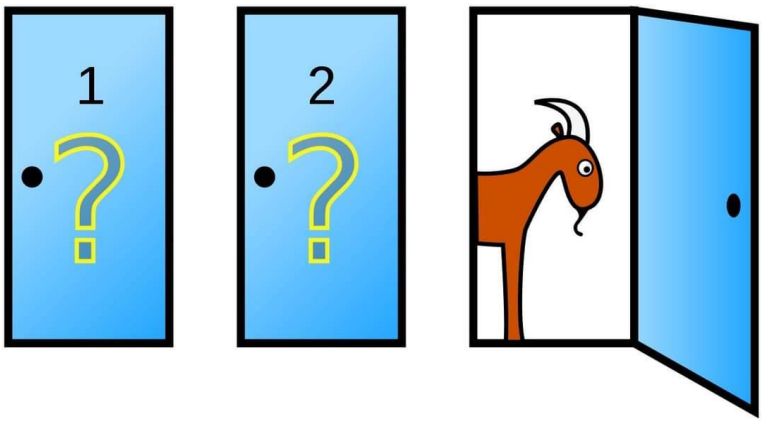

ফেলায় আপনি দেখলেন দরজা - ৩ এর পিছনে ছাগল আছে। তাই দরজা - ৩ এর পিছনে গাড়ি থাকতে পারে না বা দরজা - ৩ এর পিছনে গাড়ি থাকার সম্ভাবনা এখন ০ (শূন্য)।

এখন আপনি যদি দরজা - ১ আর দরজা - ৩ এর পিছনে গাড়ি থাকার মোট সম্ভাবনা থেকে দরজা - ৩ এ গাড়ি থাকার সম্ভাবনা বাদ দিয়ে দেন। তাহলে দরজা - ১ এর পিছনে গাড়ি থাকার সম্ভাবনা পেয়ে যাবেন।
সুতরাং দরজা - ১ এর পিছনে গাড়ি থাকার সম্ভাবনা = ২/৩ - ০ = ২/৩!!

এই সমাধানটাও আপনাকে বলছে দরজা - ১ এর পিছনে গাড়ি থাকার সম্ভাবনা ২/৩। যা দরজা - ২ এর পিছনে গাড়ি থাকার সম্ভাবনা (১/৩) থেকে দ্বিগুণ।
তাই গেমের দ্বিতীয় ধাপে আপনাকে যখন মন্টির মত পরিবর্তনের সুযোগ দিয়েছে। তখন আপনার মত পরিবর্তন করা উচিত।

আর এইভাবেই দৈনন্দিন জীবনে গণিত ব্যবহার করে আপনি এক ধাক্কায় বড়োলোক হয়ে যেতে পারেন।

জীবন হোক গণিতময়

চুইংগাম যেভাবে ইমোশন কন্ট্রোল করে

নুসরাত জাহান, শিক্ষার্থী।

স্নায়ুবিজ্ঞানীদের গবেষণার মতে, মানুষের স্বতন্ত্র মানসিক অবস্থা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চলের বৃহত্তর কার্যকলাপের সাথে যুক্ত। যেমন যখন মস্তিষ্কের কিছু অংশকে সমস্ত মানসিক প্রতিক্রিয়ার সাথে যুক্ত করা হয়, আর হাইপোথ্যালামাসকে (Hypothalamus) প্রায়শই যৌন প্রতিক্রিয়া এবং ঘনিষ্ঠতার অনুভুতির জন্য দায়ী করা হয়। হিপোক্যাম্পাসকে (Hippocampus) আবেগ উদ্দীপক স্মৃতি পুনরুদ্ধারের জন্য এবং অ্যামিগডালাকে (Amygdala) ভয় এবং ক্রোধের উদ্রেকের জন্য দায়ী করা হয়।

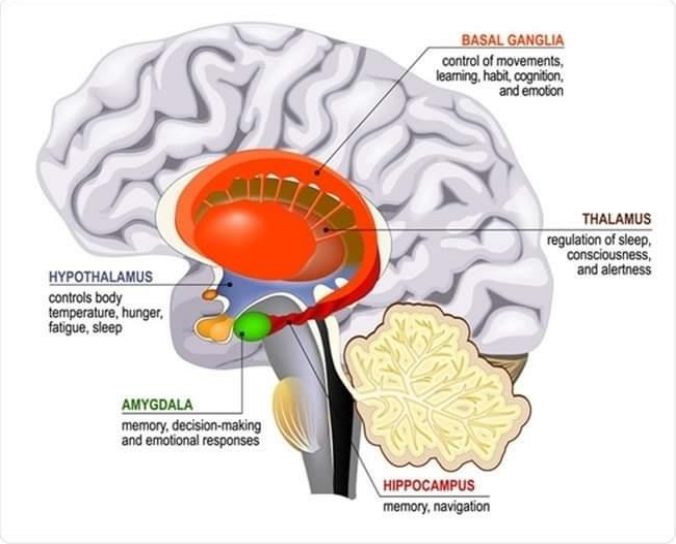

বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতি মানুষের মনে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তেমনি মানুষ যখন খাদ্য গ্রহণ করে খাদ্যের স্বাদ তার মস্তিষ্কে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়।

এখন পর্যন্ত তুলনামূলকভাবে অল্প কিছু গবেষণায় বিভিন্ন খাদ্যের ভিন্ন স্বাদের জন্য উদ্ভূত মানসিক অবস্থার সাথে মস্তিষ্কের কর্টেক্সের বিভিন্ন অংশের কার্যকলাপের যোগসূত্র অনুসন্ধান করা হয়েছে।

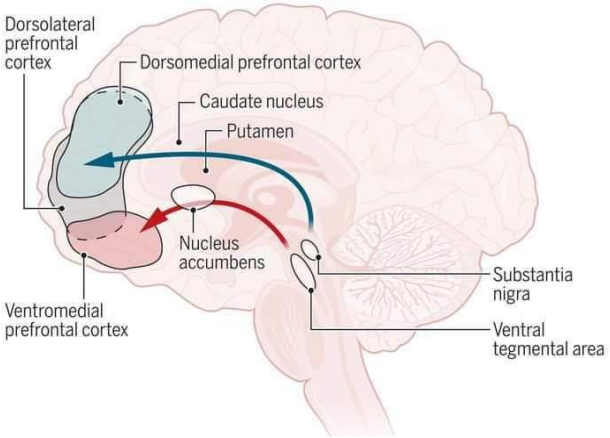

গবেষকেরা সম্প্রতি একটি গবেষণা চালিয়েছেন যেখানে, বিভিন্ন স্বাদযুক্ত চুইংগাম দ্বারা উদ্ভূত

মানসিক প্রতিক্রিয়া এবং ঐ প্রতিক্রিয়াগুলোর সাথে সম্পর্কিত কর্টিকাল কার্যকলাপের শনাক্ত করা হয়। তাদের এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয় ফ্রন্টিয়ার্স ইন নিউরোসায়েন্স নামক গবেষণাপ্রবন্ধে। এই ফলাফলটি সুস্বাদু বা কম স্বাদযুক্ত খাবার খাওয়ার সময় মানসিক অবস্থা তৈরীতে বাম প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্সের ভুমিকা তুলে ধরে।

বিভিন্ন স্বাদের খাবার খাওয়ার সময় তৈরী হওয়া মানসিক অবস্থার দ্বারা কর্টিকাল কার্যকলাপ পরিবর্তিত হতে পারে। গবেষকরা বিভিন্ন স্বাদ ও গন্ধের খাবার খাওয়ার সময় মাল্টিপল নেয়ার-ইনফ্রারেড স্পেক্ট্রোস্কোপির (Multiple near-infrared spectroscopy) সাহায্যে কর্টিকাল কার্যকলাপ পরীক্ষা করেছেন। বিষয়টি তাদের গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়।

৩৬ জন স্বেচ্ছাসেবকের ওপর এই পরীক্ষাটি চালানো হয়। এই স্বেচ্ছাসেবকদের বিভিন্ন স্বাদের চুইংগাম চিবিয়ে খেতে দেওয়া হয়। কিছু বেশি স্বাদযুক্ত এবং কিছু কম স্বাদযুক্ত। প্রতিটি চুইংগাম ৫ মিনিট করে চিবোতে বলা হয়। তারপর তাদেরকে এই গামগুলির স্বাদ, গন্ধ এবং স্বাদের ভিত্তিতে রেটিং করতে বলা হয়।

যখন তারা বিভিন্ন স্বাদের গাম চিবিয়েছেন, তখন তাদের কর্টিকাল কার্যকলাপ মাল্টিচ্যানেল নেয়ার-ইনফ্রারেড স্পেক্ট্রোস্কোপির সাহায্যে রেকর্ড করা হয়।

গবেষকরা একটি ভিজুয়্যাল অ্যানালগ স্কেলের সাহায্যে প্রতিটি চুইংগামের স্বাদ, গন্ধের প্রেক্ষিতে মান নির্ধারণ করেন। চুইংগাম চিবানোর সময় মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল এবং প্যারিটাল লোবগুলিতে দ্বিপাক্ষিক হেমোডায়নামিক প্রতিক্রিয়া, দ্বিপাক্ষিক ম্যাসেটার পেশী সক্রিয়করণ এবং হার্টরেট মাপা হয়। গাম চিবানোর সময় পরিমাপ করা সমস্ত ডেটার পরিবর্তন মূল্যায়ন করা হয়।

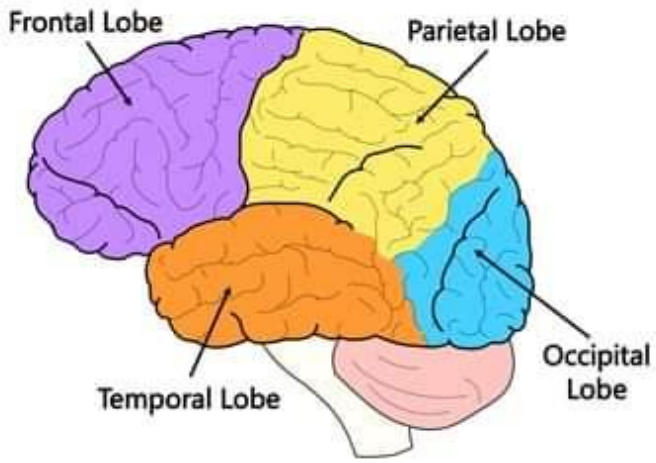

স্বাভাবিকভাবেই গবেষকরা দেখেন যে, অংগ্রহণকারীরা তাদের ব্যক্তিগত পছন্দের ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি গামকে আলাদা রেটিং করেছেন। তা সত্ত্বেও তারা লক্ষ্য করেন, প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্সের একটি নির্দিষ্ট এলাকা, যেমন বাম অংশটি কম বা বেশি স্বাদযুক্ত গাম চিবানোর সময় ভিন্নভাবে সক্রিয় হয়েছে।

স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় চিবানোর সময় কর্টেক্সের হেমোডাইনামিক প্রতিক্রিয়াগুলি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যায়। গবেষকরা তাদের গবেষণাপত্র উল্লেখ করেছেন,
যদিও হেমোডায়নামিক প্রতিক্রিয়া মস্তিষ্কের বিভিন্ন জায়গায় চুইংগাম খাওয়ার ফলে খুব বেশি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি, তবে এটি মস্তিষ্কের বাম ফ্রন্টপোলার/ডার্সোল্যাটারাল প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স অঞ্চলে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

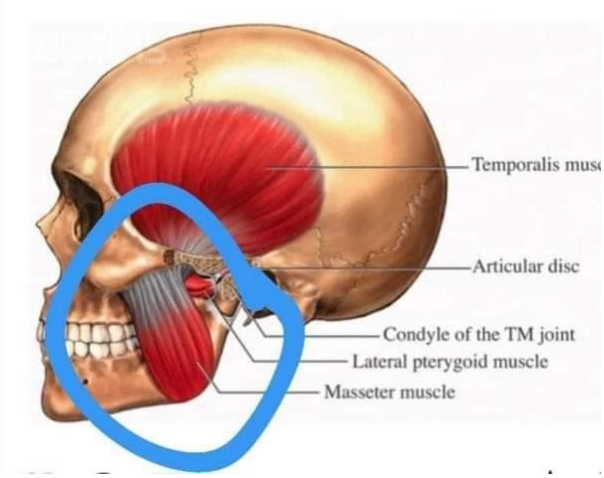

বিভিন্ন গাম চিবানোর সময় পেশী সক্রিয়করণ এবং হার্টরেট উল্লেখযোগ্যভাবে আলাদা ছিল না।

বাম প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সের ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়াকরণ সুস্বাদু ও কম স্বাদযুক্ত খাবার খাওয়ার কারণে সৃষ্ট মানসিক অবস্থার জন্য দায়ী হতে পারে।

সাম্প্রতিক করা এ ধরনের গবেষণাগুলি বিভিন্ন ধরনের খাবার খাওয়ার ফলে সৃষ্ট মানসিক অবস্থা বুঝতে এবং সকল মানসিক অবস্থার সাথে যুক্ত কর্টিকাল অঞ্চলগুলির প্রতিক্রিয়া বুঝতে সাহায্য করবে।